অ্যাডজাস্টমেন্ট

– এম এ মালেক

ভালোবাসা যৌবনের ধর্ম এবং আচরণ। জীবন সায়াহ্নে স্তিমিত শোনিতে সত্তরোর্ধ বয়সে ভালোবাসা সংক্রান্ত ঘটনাবলীর ওপর লেখালেখি এবং পরিবার-পরিজনের বিদ্রূপ বাক্যবাণকে ওভারটেক করে লেখা পাঠানোর আনন্দই আলাদা। অবশ্য যদি ছাপে।

ভালোবাসা কি? নানান জনের নানান মত। আমার ধারণা নারী-পুরুষের নিবিড় সম্পর্কের প্রথম ভিত পছন্দ। পছন্দ থেকে ভালোলাগা। ভালোলাগা থেকে ভালোবাসার জন্ম। পরের স্তর দুজনে-দুজনায়, প্রেম-প্রীতি, মায়া-মমতায়, সোহাগে হাবুডুবু খাওয়া। বিয়ে শেষ হলে নতুন গল্পের সূচনা। নচেৎ দুঃখ-কষ্ট, বঞ্চনায় দেবদাস। ভালোবেসে বিয়ে প্রাপ্তিযোগ প্রায়ই সুখকর হয় না। কঠিন সংসারে ভালোবাসার রঙ চটে গেলে মনে হয় ভালোবেসে বিবাহ না করে ওকে বা তাকে বিয়ে করলেই বোধহয় সবচেয়ে ভালো হতো। এছাড়া বিবাহিত জীবনে অ্যাডজাস্টমেন্টের অভাবে ছন্দপতন ও বিপর্যয় ঘটে। এই ছন্দপতনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে যোগ হয় ব্যক্তিত্বের সংঘাত, চরিত্রে অবিশ্বাস, শাশুড়ি-বৌয়ের গরমিল (বাঙালির চিরন্তন সমস্যা), আর্থিক অনটন ইত্যাদি। ব্যতিক্রমও আছে। ভালোবাসার গল্প বলতে গিয়ে অভিজ্ঞতার আলোকে আমার কিছু বাস্তব ঘটনা তুলে ধরছি।

আমার চাচাতো বোনের ছেলে হ্যান্ডসাম রফিক কলেজের এক ফাংশনে কবিতা আবৃত্তি করেছিল ও রূপা গান গেয়েছিল। প্রথম সাক্ষাতেই পছন্দ, ভালোলাগা ও ভালোবাসায় দুজনেই হাবুডুবু খায়। প্রেমকালীন প্রতিজ্ঞা বজায় রাখতে মা-বাবার পছন্দের পাত্রের সঙ্গে বিয়ের ঠিক আগের দিন রূপা পালিয়ে আসে। রফিকের কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবের সহায়তায় কাজী অফিসে গিয়ে বিয়ে করে এবং অনিশ্চয়তায় ঢাকায় না এসে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতেই সোজা শ্বশুরবাড়ি চলে যায়। দুবছর আগ-পিছ দুজনেই বিএ পাস। রফিকের বাবা নেই। মা ও দুই ভাই-বোন নিয়ে সংসার। মা এই বিয়ে মেনে নেননি। কেবলই বলেন, এক কাপড়ে চলে এসেছে। মা-বাবা কোনো খোজখবর নেন না। এ সংসারে বৌ অলক্ষ্মী।

এদিকে এক বছরের মাথায় রূপার একটি মেয়ে হয়েছে। শাশুড়ি ও ননদ অসন্তুষ্ট। এক জ্যোতিষী নাকি রফিকের হাত দেখে বলেছে, তার আরেকটি বিয়ে হবে। রফিক আমার ঢাকার বাসায় এসে এগুলো জানিয়ে উপদেশ চায়। তার মা অনেক বলে-কয়ে তাকে আমার কাছে পাঠিয়েছে এই বলে যে তোর মামা সাধক মানুষ। এদিক-ওদিক জঙ্গলে ঘুরেছে এবং অনেক কিছু জানে, তোকে সঠিক উপদেশ দিতে পারবে। তুই এই বৌ রাখবি কি রাখবি না?

বুঝলাম রফিকের সংসারে মহা সমস্যা ও সংকট বিরাজমান। ত্রিশ বছরের স্বল্পজ্ঞানী একজন শৌখিন হস্তরেখাবিদ হিসেবে রফিকের হস্তের রেখাগুলো দেখে বললাম, বিয়ে তোমার একটাই এবং তা হয়ে গেছে। সে বললো, তবে ওই জ্যোতিষী কি ভুল বলেছে?

হ্যা, অনেকটাই ভুল। হাতে বুধ গ্রহে দুটি রেখা থাকলেই দুটি বিয়ে হয় না। এর গভীর অর্থ এবং ভিন্নতাও আছে। হ্যা, একটি ব্যাপার জেনে রেখো ভালোবাসার বিয়েতে দুজনের পেছনে ব্ল্যাক পাওয়ার অর্থাৎ দুষ্টচক্র খুব বেশি লেগে থাকে। সুন্দরতম জুটিকে ভেঙে দিয়ে সংসারে অশান্তি সৃষ্টি করে। একেই বলে *গ্রহের ফের*। তুমি বাড়িতে গিয়েই সুললিতকণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি করবে, আর বৌকে বলবে খালি গলাতেই গুন গুন করে গান গাইতে। দুজনেই ভালোবাসার পূর্বরাগে ফিরে যাও। দেখবে রূপাও ছেড়ে যেতে চাইবে না, আর তোমারও দ্বিতীয় বিয়ের দুর্মতি হবে না। মনে রেখো রূপা সব ছেড়ে তোমার কাছে এসেছে। তুমি ছাড়া তার কেইবা আছে?

রফিক আমার কথাগুলো শুনে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো। দুষ্টগ্রহ এড়াতে এই রত্নটা ধারণ করতে থাকো। তোমার মাকে সব বুঝিয়ে বলবে। প্রায় তিন মাস পর হঠাৎ রফিক ঢাকায় আমার বাসায় এসে খবর দিয়ে গেল বোনের খুব ভালো বিয়েহ হয়ে গেছে। তার মা বয়সের ভারে হঠাৎ পা পিছলিয়ে বিছানায়

শয্যাশায়ী এবং বৌটিই এখন সংসারের চালিকাশক্তি। প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের কাছে বৌটির ধৈর্যের এবং সেবার সুনাম চারদিকে। রফিকও খুবই খুশি। এটুকুর অ্যাডজাস্টমেন্ট ভালোবাসার সম্মান রক্ষা করেছে।

দ্বিতীয় ঘটনা। এটিও একটি প্রেমের বিয়ে। খালাতো ভাইয়ের মেয়ে মিলি ও স্বামী মুহিত। মিলি বিএ (অনার্স) এবং মুহিত মাস্টার্স। মেয়ের বাবা ঢাকার একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। ধনী, অহংকারী ও খুতখুতে মেজাজের। ভালোবাসার বিয়ের পর মেয়েকে আটকে না রেখে শুধু বললেন, তুমি ছেলেটিকে ছেড়ে চলে এসো, এর চেয়ে ভালো বিয়ে দেবো। নচেৎ চলে যাও। আপত্তি নেই।
প্রেমিক স্বামীটি বাইরে রাস্তায় কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে অপেক্ষা করছিল। মেয়েটি কোনো কথা না বলে চুপচাপ নীরবে ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় মেয়েটির মা আমাকে চোখের ইঙ্গিতে কাছে যেতে বলে আড়ালে আমার হাতে কিছু দিল। দেখলাম টাকা এবং এর সঙ্গে আমিও কিছু মিলিয়ে মেয়েটির পিছনে বের হয়ে এলাম। মেয়েটিকে অনেক বোঝালাম। দেখলাম সেও খুব জেদী ও স্থির প্রতিজ্ঞ। কিছু স্বাভাবিক উপদেশ দিয়ে তার হাতে গোপনে টাকাটা তুলে দিয়ে শুধু বললাম, দোয়া করি তুমি জীবনে জয়ী ও সুখী হও।
মাঝেমধ্যে মিলি আমার সঙ্গে টেলিফোনে এটা-ওটা নিয়ে কথা বলতো। এভাবে প্রায় দুই বছর চলে গেল এবং বিশেষ অনুরোধে তাদের রামপুরার ভাড়া বাসায় গিয়ে ছিমছাম অবস্থা দেখে বুঝলাম যেন একটি ছোট সুখের নীড়।
মিলি সংক্ষেপে বললো, বাড়ির মালিক এখানকার স্থানীয় প্রভাবশালী এবং খুবই ভালো বিধায় তার সম্মতিতেই প্রথমে ব্যাচে টিউশনি এবং সংক্ষিপ্ত ট্রেনিংয়ের পর দুই রুমের একটিতে বিউটি পার্লার। একটি এনজিও অফিসে রফিক চাকরি পেয়েছে এবং নিজের কর্মদক্ষতায় সম্প্রতি একটি প্রমোশনও পেয়েছে। আমি কেবল টিউশনি, পার্লার ও সংসারের যাবতীয় কাজকর্মের শৃঙ্খলা নিয়েই ব্যস্ত থাকি এবং অবসরে ভালো নোট লেখালেখি ও ফটোস্ট্যাট করি। ওর দেশের বাড়ি টাঙ্গাইল থেকে শাশুড়ি কয়েকবার এসেছিল। খুবই ভালো। আমিও কয়েকবার গেছি। সে দেশের সহায়-সম্পত্তি ওর বর্ণনার চেয়েও বাস্তবে দেখলাম অনেক বেশি। তাই ওর ওপর আমার বিশ্বাস ও আস্থা আরো বেড়ে গেছে। ব্যাচে দিনের বেলায় মেয়েদের আমি এবং সন্ধ্যার পর ছেলেদের সে পড়ায়। ওর অসুবিধা হলে আমি চালিয়ে নেই।
বিয়ের পর গত দুই বছর আমরা ফ্যামিলি প্ল্যানিং করে চলেছি এবং আরো দুই বছর চলবো। এরই মধ্যে আমাদের সেভিংসের টাকা থেকে মাদারটেক নন্দীপাড়ায় কেনা তিন কাঠা জায়গাটিতে মাটি ভরাট করে কয়েকটি ঘর তুলে ভাড়া দিয়ে দেবো। এবং সেই ভাড়ায় এই বাসার ভাড়া কভার হয়ে যাবে। উপার্জন এবং সেভিংসই আমাদের বর্তমান লক্ষ্য। আমাদের মধ্যে অহেতুক কোনো ভুল বোঝাবুঝি, তর্কাতর্কি, রেষারেষি, রাগারাগি এগুলোর নামগন্ধও নেই।
আমরা বিয়েবার্ষিকী এবং ১৪ ফেব্রুয়ারি *ভালোবাসা দিবসটি* খুবই আন্তরিকভাবে পালন করে থাকি। ওইদিন ও ছুটি নেয় এবং আমি কাজ বন্ধ রাখি। ক্যাম্পাসে যাই, ঘোরাফেরা করি, দুপুরে বাইরে খাই, খুবই আনন্দ লাগে। খালুজান আপনিও ভালো হাত দেখেন, তাই আমারটাও একটু দেখে একটি গ্রহরত্ন দিলে খুশি হবো।
হাসতে হাসতে বললাম, তা আর তোমাদের লাগবে না। কারণ তোমাদের পেছনের দুষ্টগ্রহ এমনিতেই অনেক দূরে সরে গেছে এবং সবচেয়ে বড় গ্রহরত্ন হলো তোমাদের ভালোবাসার সেতুবন্ধন অ্যাডজাস্টমেন্ট। তোমাদের দুজনের ভালোবাসার রঙ পাকা। অ্যাডজাস্টমেন্ট দিয়ে ঝালাই করা। ফেরার পথে মনটা আমার প্রশান্তিতে ভরে গেল।
বিবৃত দুটি ঘটনা ভালোবাসা ও প্রেম করে বিয়ে করে সংসার করার গল্প। যৌথ পরিবারে অন্য জাতক-জাতিকারা বিবাহিত জীবন, শ্বশুর-শাশুড়ির বিরূপ ভূমিকা, স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিগত সংঘাত ইত্যাদি কারণে

নানান ঘটনা এবং জীবনযাপন করার কাহিনী ভিন্নতর। এছাড়া জাতক-জাতিকাদের পরকীয়ায় লিপ্ত হওয়ার কাহিনী আরো চমকপদ। নিজেদের ব্যক্তিগত ফতোয়ায় জায়েজ করার অপপ্রয়াসের পর অনেকে উপদেশ চায়। আমি শুধু সংক্ষেপে বলি, অবৈধভাবে উপার্জিত অর্থ যেমন *ব্ল্যাক মানি,* তেমনি অবৈধ পরকীয়া যৌনকর্মও হলো *ব্ল্যাক সেক্স*। বাকিটা আপনাদের বিবেক, মন, ইচ্ছা ইত্যাদির কার্যকারিতা এবং জবাবদিহিতার পরিচায়ক। শব্দের সীমাবদ্ধতার কারণে সুযোগ হলে আগামী ভালোবাসা সংখ্যায় আবার লেখার আশা রাখি।

ভালোবাসা-প্রেম কি অপূর্ব এক মোহন মন্ত্র? যা জীবনকে ঐশ্বর্যময় করে। আবার না পাওয়া অথবা অ্যাডজাস্টমেন্টের অভাবে বিষময়ও করে। উফ! ভালোবাসা, হায় ভালোবাসা।

বাসাবো, ঢাকা থেকে

সাইলেন্ট লাভ

– দীপক

সাধারণত প্রত্যেক মানুষের জীবনেই প্রেম আসে। সেটা হতে পারে দ্বিপাক্ষিক। কিন্তু আমার প্রেম সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী।

সে ছিল আমার বৌদির ছোট বোন। নাম তার শিলা। শিলাকে প্রথম এবং শেষ দেখেছি আরো দুই বছর আগে বৌদির বিয়ে অনুষ্ঠানে। তাকে প্রথম দেখেই আমার খুব পছন্দ হয়েছিল। অপ্সরার মতো মুখমণ্ডল ও কোকড়ানো চুলে তাকে অপরূপ লাগছিল।

ওইদিন যতোক্ষণ বিয়ে বাড়িতে ছিলাম ততোক্ষণ পর্যন্ত বিভিন্ন লোকের চোখ ফাকি দিয়ে তার দিকে তাকিয়েছিলাম। শিলার সঙ্গে আমার কয়েকবার চোখাচোখি হলেও তাতে তেমন ভাব প্রকাশিত হয়নি। পরে বৌদির কাছে তার ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে পেরে আমার ভালোবাসা আরো বেড়ে গেল। বৌদি আমার মনোভাব বুঝতে পেরে আমাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করার আশ্বাস দিলেন।

তারপর বৌদির মাধ্যমে তার সঙ্গে ফ্রেন্ডশিপের ইচ্ছা প্রকাশ করে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলাম।

শিলা উত্তরে বলেছিল, আমার সঙ্গে সরাসরি কথা বলা ছাড়া সে আমার সঙ্গে ফ্রেন্ডশিপ করবে না।

তার অভিভাবকরা আমার ব্যাপারে জানতে পেরে বৌদিকে বলেছিলেন, আমি যদি আরেকটু বড় হতাম অর্থাৎ চাকরি করতাম তাহলে এটা সম্ভব হতো।

এদিকে আমার কলেজের বন্ধুরা শিলার কথা জানতে পেরে তাকে এক চান্সেই বৌদি বলে ডাকতে শুরু করেছে।

এখন একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই জানে তাদের এই বৌদি ডাকা কোনোদিন বাস্তবে রূপ নেবে কি না। আমিও সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করি, হায় প্রভু! তুমি আমাকে পৃথিবীতে পাঠালে যখন আরো কয়েক বছর আগে পাঠালে কি ক্ষতি হতো?

শিলা যদি আমার এ লেখা দেখে তাহলে সে নিশ্চই বুঝবে আমার *সাইলেন্ট লাভ* কতোটা গভীর।

ঢাকা থেকে

পরীক্ষা

–মোহাম্মদ মহসীন হায়দার শ্রাবণ

কোনো এক সময় এক দেশে এক রাজা ছিল। তার প্রচুর ধন-সম্পত্তি ছিল। তার প্রচুর সৈন্য-সামন্ত এবং অনেক হাতি ও ঘোড়ার পাল ছিল। তাছাড়াও রাজার তিন সুন্দরী রমণীও ছিল। প্রত্যেকেই রাজাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তিনজনের মধ্যে প্রথম যাকে বিয়ে করেছিলেন তার নাম রূপবান। দ্বিতীয়জনের নাম নূরজাহান এবং তৃতীয়জনের নাম গুলবাহার।

রাজা একদিন মনে মনে ঠিক করলেন, কোন স্ত্রী তাকে বেশি ভালোবাসে তা তিনি আবিষ্কার করবেন। সে জন্য তিনি একটি বুদ্ধি বের করলেন। তা কাজে লাগানোর আগে তিনি স্ত্রীদের একত্র করে তাদের মুখ থেকে ভালোবাসার কথা জানতে চাইলেন।

রূপবান বললেন, রাজা সাহেব আমি আপনার প্রথম, তাই আমি আপনাকে প্রথম থেকে যেভাবে ভালোবাসতাম এখনো ঠিক সেভাবে ভালোবাসি। তারপরও কিছু ভালোবাসা আমার সন্তানের জন্য নিবেদিত এবং তা আমার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত নিবেদিত থাকবে। তা কখনো নিঃশেষ হবে না।

নূরজাহানকে যখন প্রশ্ন করা হলো তখন তিনি বললেন, জাহাপনা প্রতিদিন ভোরে আখি মেলার সময় মনে মনে আপনার চেহারা মোবারক দেখার প্রত্যাশা করি এবং রাতে নয়ন বোজার আগে আপনার মুখটাই দেখতে চাই। সুতরাং আপনাকে আমার দুটি নয়নের চেয়েও বেশি ভালোবাসি।

গুলবাহার বললেন, শাহেনশাহ, আপনি হচ্ছেন আমার সব সুখের উৎস। আপনাকে ঘিরেই আমার সব আনন্দ এবং স্বপ্ন। সুখ বলতে আমি যা বুঝি তা হলো শুধু আপনাকেই ভালোবাসা আর কিছুই নয়।

রাজা প্রথম স্ত্রীর কথায় খুব একটা আনন্দ অনুভব করলেন না। কারণ তিনি চেয়েছিলেন ভালোবাসায় যেন আর কাউকে অংশীদার করা না হয়। কিন্তু রূপবান তার সন্তানের কথা উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্ত্রীরও সন্তান আছে, কিন্তু তারা তা উল্লেখ করেননি।

এবার রাজা ভালোবাসার কথাগুলো প্রমাণ করার জন্য তার বুদ্ধিটা কাজে লাগালেন। তিন স্ত্রীকে ডেকে বললেন, আমি আর রাজ্য শাসন করতে চাই না। আমার শরীরে ক্লান্তি এসে গেছে। তাই বিশ্রাম নিতে চাই। কিন্তু শাসনভার কাকে দেবো? সন্তানরা এখনো উপযুক্ত হয়নি। তাই ভাবছি শাসনভার আপনাদের মধ্যে ভাগ করে দেবো। আমি কোনো একটি দ্বীপপুঞ্জে বসবাস করবো। এখন আপনারা কে কোন প্রদেশের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে চান বলুন।

প্রথমে কনিষ্ঠ স্ত্রী গুলবাহারকে বলতে বলা হলো। তিনি তিনটা বড় প্রদেশের কথা বললেন। রাজা বললেন, ঠিক আছে সেগুলো আপনাকে দেয়া হবে।

পরে দ্বিতীয় স্ত্রী নূরজাহানও তিনটি প্রদেশ বাছাই করে নিলেন যেগুলো খুব সমৃদ্ধশালী। রাজা তাকেও দেবেন বলে অনুমতি দিলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় স্ত্রী ভাগাভাগি করে নেয়ার পর তৃতীয় স্ত্রীর ভাগে দুটি প্রদেশ রইলো।

রাজা তৃতীয় স্ত্রীকে প্রশ্ন করলেন, আপনার ভাগে দুটি পড়েছে, তাতে কি আপনি নিরাশ হয়েছেন?

আমি প্রদেশ চাই না।

তাহলে কী চান?

আমি আমার সন্তানকে নিয়ে আপনার সঙ্গে দ্বীপপুঞ্জে বসবাস করার অনুমতি চাই। রূপবানের কণ্ঠে মিনতি।

তখন রাজার কাছে দিনের আলোর মতোই স্বচ্ছ হয়ে গেল, তিন স্ত্রীর মধ্যে রূপবানই তাকে সবচেয়ে বেশি এবং সত্যিকারে ভালোবাসে। তাই তিনি রূপবানকে রাজ্যের দ্বিতীয় সম্মানিত ব্যক্তি ঘোষণা করলেন।

অপরপক্ষে গুলবাহার ও নূরজাহানকে বললেন, তোমরা পৃথিবীতে সবচেয়ে লোভী মহিলা। আমার রাজ্যে লোভীদের কোনো স্থান নেই।

রাজা তাদের নির্বাসনে পাঠালেন।

(বিদেশি গল্পের ছায়া অবলম্বনে রচিত)

ফতেপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম থেকে

হাজার বছর ধরে

আমার একমাত্র ছেলে খোকন এবার এমবিএ পাস করেছে। আমি খুব খুশি। সেদিন খাবার টেবিলে বসে খোকনকে বললাম, তোমার পড়াশোনা তো মোটামুটি শেষ হলো। এখন থেকে আমাদের সাভার অফিসে

বসো। ধীরে ধীরে কাজকর্ম বুঝে নাও। আমি ম্যানেজারকে বলে দিয়েছি। তোমার জন্য চেম্বার ঠিক করা হয়েছে। খোকন অবাক হয়ে বললো, বাবা, তুমি কি দেশের বাইরে যাচ্ছো?

না, আমি কোথাও যাচ্ছি না। তবে একদিন তো যেতেই হবে, চিরদিন কি বেচে থাকবো?

ওসব কথা তুমি মুখে এনো না। তুমি না থাকলে আমি কি করবো? একা হয়ে যাবো। তাছাড়া ব্যবসার আমি কি বুঝি? মিল ইন্ডাস্ট্রি তো তুমিই দেখছো। আমাকে নিয়ে কেন টানাটানি করছো বাবা?

আমার বয়স হয়েছে। আজ আছি কাল নেই। একদিন তোমাকে সবকিছু বুঝে নিতে তো হবে। আর হ্যা তোমাকে যাতে একা থাকতে না হয়, সে কথাও ভেবেছি। কথা যখন উঠলো, শোনো খোকন তোমার মা যদি আজ বেচে থাকতেন, তার মুখেই এ কথা শুনতে। তিনি বেচে নেই, এখন আমি একাধারে তোমার মা, বাবা এবং বন্ধু তাই না? খোলাখুলি বলছি, তুমি বড় হয়েছো, তোমার পছন্দের কেউ যদি থাকে আমাকে বলো।

বাবা, তুমি যে কি বলো!

এরপর খোকন চুপ হয়ে গেলো। বললাম, এই মুহূর্তেই তোমাকে বলার জন্য বলছিনে। পরে ভেবেচিন্তে আমাকে বললে চলবে।

খোকন যথারীতি অফিসে যেতে শুরু করেছে। রাতে তার সঙ্গে খাবার টেবিলে ব্যবসা সংক্রান্ত নানা কথাবার্তা হয় কিন্তু যে কথাটি জানার জন্য আমি উদগ্রীব তার কাছ ঘেষেও যাচ্ছে না দেখে একদিন বললাম আগামী দুই দিন তো সাপ্তাহিক ছুটি। আমার বাইরে যাবার কোনো প্রোগ্রাম নেই, সারাদিন বাড়িতেই থাকবো। আমি যা জানতে চেয়েছিলাম তা আবার স্মরণ করিয়ে দিলাম।

খোকন মিটি মিটি হেসে বললো, আচ্ছা বাবা।

পরদিন অফিস যাবার তাড়া নেই। ড্রইংরুমে চোখ বুজে কি জানি কি ভাবছিলাম। হঠাৎ পায়ে স্পর্শ অনুভব করতেই চোখ খুলে দেখলাম আমার পা ছুয়ে সালাম করে দাড়িয়ে একটি মেয়ে। হালকা গোলাপি রংয়ের সালোয়ার-কামিজ পরনে, তাজা ফুলের মতো মেয়েটি। সেই ডাগর ডাগর চোখ দেখে মুহূর্তে মনির চেহারা মনের মুকুরে ভেসে উঠলো। আমি মেয়েটির মাথায় হাত রাখলাম। খোকন অদূরে দাড়িয়ে হাসছে।

বাবা, তার নাম সুমী। মেডিকাল কলেজে পড়ছে। খোকন বললো।

তা বেশ তো! কোন কলেজে পড়ছো? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

সলিমুল্লাহ মেডিকাল কলেজে।

কোন ইয়ারে?

ফাইনাল ইয়ারে।

শুনে খুবই ভালো লাগলো। তোমাদের দেশের বাড়ি কোথায়?

নড়াইলে।

নড়াইলে?

জি হ্যা। গ্রামের নাম এ্যারেণ্ডা।

এ্যারেণ্ডা? চৌধুরী বাড়ির কোন দিকে?

ওই বাড়িই তো আমাদের।

তুমি কি মনির মেয়ে?

জি হ্যা। এটা আমার মায়ের ডাক নাম। আপনি কি মাকে চেনেন?

হ্যা, চিনি বৈকি।

মেয়েটির সঙ্গে অনেক কথাবার্তা হলো। দুপুরের খাবার খেয়ে বিকেলে হোস্টেলে ফিরে গেলো। খোকনের মনে প্রশ্ন, বাবা সুমীর মাকে চেনেন, চৌধুরী বাড়ির মেয়ে শুনে বাবা অমন করে হঠাৎ আনমনা হয়ে গেলেন

কেন? বাবার এতোদিনের নিঃসঙ্গ জীবনে এমন তো কোনোদিন দেখিনি। অনুরূপভাবে সুমীর মনেও ওই একই প্রশ্ন। ঢাকায় মার পরিচিত একজন আছেন, অথচ মা কোনোদিন এ কথা বলেননি। কি রহস্য।

এভাবে কিছুদিন কাটলো। একদিন খোকনকে বললাম, অফিসের কাজ কর্মে তো ক্লান্ত হয়ে গেছ মনে হচ্ছে। আমরা কয়েক দিনের জন্য বাইরে কোথাও ঘুরে এলে কেমন হয়? খোকা বাইরে যাওয়ার কথা শুনে এক পায়ে খাড়া।

কোথায় যাবে বাবা, চলো কুয়াকাটা যাই। অনেক দিন যাওয়া হয়নি।

তার চাইতে গ্রামের বাড়ির দিকে গেলে কেমন হয়?

সেখানে আমাদের কে আছে বাবা?

তোমার এক দূর সম্পর্কের ফুফু আছেন। তার ওখানে যাওয়া যায়।

খোকনের মনে প্রশ্ন জাগলো, গ্রামে আমার এক ফুফু আছেন বাবা তো কোনো দিন এ কথা বলেননি।

খোকন মুখে বললো, তাই চলো, তোমার যেমন ইচ্ছে।

মনির মেয়েটিকে দেখার পরই অতীতের স্মৃতি মনে এলো নতুন করে। মনি আমার বন্ধু ও সহপাঠী মনার বোন। আমি বরাবরই অংকে কাচা ছিলাম। অংক কষতে ওদের বাড়িতে প্রায়ই যেতাম। মা-বাবা নেই জেনে ওদের মা আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। আপন হয়ে গেলাম আমি। যেন ঘরের ছেলে। মনির বয়স তখন দশ কি বারো। আমি ওদের বাড়িতে গেলে কাজে অকাজে পড়ার ঘরে এসে ঘুর ঘুর করতো। হালকা পাতলা, দোহারা গড়ন। হরিণীর মতো বড় দুইটি চোখ। সেই চোখ দিয়ে জানালার পর্দা সরিয়ে চেয়ে থাকতো। চোখাচোখি হয়ে যেতো। কথা হতো না। এভাবে আমাদের ভালো লাগার কলি পুষ্পপল্লবিত হতে থাকলো।

এসএসসি পাস করে আমরা জেলা সদরের কলেজে ভর্তি হলাম। দূরে গিয়ে শুরু হয় চিঠি চালাচালি। এভাবে দিন যায়, বেলা বাড়ে। মনিও ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরে। পড়াশোনা করে। ধীরে ধীরে আমরা একজন আরেকজনের কাছের মানুষ হয়ে গেলাম। অকূল সমুদ্রে আমাদের ভালোবাসার তরী ভাসালাম।

হঠাৎ একদিন মনির চিঠি এলো, *আমার বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে যাচ্ছে, একটা কিছু করো তাড়াতাড়ি*। আমাদের সম্পর্কের কথা মনার অজানা ছিল না। বললো, *কি করবি এখন?* ইউনিভার্সিটির গণ্ডি পার হইনি। নিজের পায়ে দাড়াইনি এ অবস্থায় রিস্ক নেয়া ঠিক হবে কি?

মনা আশ্বাস দিল যেভাবেই হোক মনির বিয়ে ঠেকাবে। মনির মা ঘোর আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন ওদের পড়াশোনা যেমন চলছে চলুক। এমন তো কোনো বয়স হয়নি ওদের। মনির বাবা তাদের কথায় কোনো পাত্তাই দেননি। মনির বিয়ে হয়ে গেল। বাবার সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়ার ভয়ে মনি বিয়ের পিড়িতে বসেছিল।

বড় ভালোবেসেছিলাম মনিকে। দুঃখ-বেদনা ও হতাশায় পড়াশোনায় মন বসলো না। পড়াশোনা শেষ না করেই ব্যাংকে চাকরি নিয়ে ইচ্ছে করেই দূরে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যাই। মনির সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখিনি। আমরা কেউই ভালো ছিলাম না। জেনেছিলাম মনি নিজেকে নিয়েই থাকে। যার যা ছিলো মনের মধ্যেই ছিলো। তা সত্ত্বেও আমি বিয়ে করেছিলাম, সন্তানের পিতা হয়েছিলাম। শয়নে স্বপনে নিদ্রায় জাগরণে মনির কথা স্মরণ হলেও আমি আমার স্ত্রীকে ঠকাইনি। হৃদয়ের সব ভালোবাসা উজাড় করে তাকে কাছে টেনে নিয়েছি যেন সেই-ই আমার হারিয়ে যাওয়া মনি। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমার স্ত্রীর ঈর্ষান্বিত ও সন্দেহপ্রবণ মন আমাকে ভালোবাসতে পারেনি, কোনোদিন আমার সঙ্গে হেসে কথা বলেনি।

পিতা-পুত্র একদিন গ্রামের বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিলাম। তখন বেলা দশটা, ছোট্ট একটা বাজার। গাড়ি থেকে নেমে মনিদের বাড়ির লোকেশন জেনে নিলাম।

হঠাৎ মধ্য বয়সী একজন লোক আমার কাছে এসে বললো, স্যার, আপনারা কি চৌধুরী বাড়ি যাবেন?

আমি হ্যা বলতেই সে বলে উঠলো, আম্মা আমাকে আপনাদের নিয়ে যাবার জন্য পাঠিয়েছেন।

তাকে গাড়িতে উঠতে বললাম। প্রায় পনেরো মিনিট পরে আমরা একটা সুদৃশ্য বাড়ির গেটের কাছে থামতেই মনি ধীর পায়ে সিড়ি থেকে নামলো। গেটের কাছে এগিয়ে এলো। চব্বিশ বছর পর মনিকে দেখলাম। একটু বদলায়নি।

পরনে তার চওড়া লাল পাড়ের সাদা শাড়ি। সাদা ব্লাউজ। গলায় পাতলা একটা সোনার চেন। মনির সঙ্গে সেই মেয়েটি সুমী। যেন দুই সহোদরা। তারা আমাদের সামনে দাড়ালো। মনি ভেজা ভেজা চোখে আমার দিকে তাকালো। ছলছলে দৃষ্টি ছিল আমারও। কোনো কথা হলো না। আমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে মিষ্টি হেসে খোকনের দিকে তাকালো।

তার হাত ধরে বললো, পথে কষ্ট হয়নি তো বাবা? এসো বাবা, এসো।

অবাক হয়ে গেলো খোকন আর সুমী। একি দেখছে তারা। কি কাকতালীয় ব্যাপার। ভাবলো মনে মনে আমাদের দুই জনের সঙ্গে পরিচয় না হলে ফুফুকে আর মামাকে কোনোদিন আমরা চিনতাম না। কেউ কারো খোজখবর রাখতেন না। যার যা ছিল মনের ভেতরই ছিল। মনে মনে আমিও ভাবলাম কিভাবে বিধাতা মিলিয়ে দিলেন আমার ছেলে খোকনকে আর মনির মেয়ে সুমীকে।

বিকেলে দোতলায় বারান্দায় বসেছিলাম। দূরে তাকিয়ে দেখলাম খোকন একা একা ঘুরে বাড়িটা দেখছে। এক সময় বাড়ির সামনে পুকুর পাড়ে গিয়ে বসলো। এদিক সেদিক তাকাচ্ছে। কাকে খুজছে? নিশ্চয়ই সুমীকে। তার জন্য মায়া হলো। সুমীটা যে কি – এতো দেরি করছে কেন?

মনি চা নিয়ে এসে আমার কাছাকাছি মুখোমুখি বসলো। আমি খোকনের দিকে তাকিয়েছিলাম।

কখন যে আমরা দুটি মানুষ এতটা কাছাকাছি হয়েছি খেয়াল করিনি।

চব্বিশ বছর আগেও এ রকম কাছাকাছি হয়েছি, মুখোমুখি বসেছি, সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু কামনার দৃষ্টিতে কেউ কাউকে স্পর্শ করিনি। সৎ থেকেছি। একে অপরকে শ্রদ্ধা করেছি।

এই মুখোমুখি হওয়া, কাছাকাছি হওয়া নিষ্পাপ ভালোবাসা যেন হাজার বছর ধরে বেচে থাকে।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

বন্ধু থেকে শত্রু

২০০২ সালের শুরুর দিকের কথা। আটজন (দুই ছেলে, ছয় মেয়ে) বন্ধু মিলে KMSZN নামে একটি ফ্রেন্ডশিপ গ্রুপ তৈরি। সবার সম্মতিতে আমাদের কিছু শর্ত আরোপ হয় যে আমাদের গ্রুপের মধ্যে কেউ একে অন্যের সঙ্গে প্রেম করতে পারবে না। যদি কারো খুব বেশি প্রেম করার ইচ্ছা জাগে তাহলে সে গ্রুপের বাইরের কারো সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে পারে, এতে কারো কোনো আপত্তি নেই। আমরা প্রত্যেকের জন্মবার্ষিকী, পারিবারিক কোনো অনুষ্ঠানে আনন্দে সবাই মিলে যোগ দিতে থাকি। এভাবে আমাদের বন্ধুত্বের ভালোবাসার পাহাড় উচু থেকে উচুতে ধাবিত হতে থাকে। এরই মাঝে আমরা কলেজের অনেক বন্ধুর কাছে হিংসার পাত্রে পরিণত হতে থাকি। হঠাৎ বিধিবাম। আমাদের এক বন্ধু (মেয়ে) কলেজের এক বন্ধুকে বিয়ে করে ফেলে। আর তখন থেকেই বিপর্যয়টা শুরু।

ওই বিপদ কাটতে না কাটতেই আমাদের আরেক বন্ধুর বিয়ের খবর শুনলাম। কষ্ট করে সবাই অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করলাম, দুই একজন ছাড়া। তার বিয়েটাই হয়তো আমাদের জন্য মহাপ্রলয় হয়ে গেল। তার বিয়ের আগেই শোনা যাচ্ছিল আমাদের মাঝের দুই বন্ধু প্রেমের ফাদে পা দিয়েছে। যদিও তারা তখন পুরোপুরি অস্বীকার করছিল। বিয়ের পর যখন সবাই শুনে ফেললো ব্যাপারটা তখন আর কেউ বৃথা চেষ্টা করেনি তাদের ওই পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে। এ সুযোগে আরেক বন্ধুও লুফে নেয় কৌশলে। তার মনের বাসনা পূরণের লক্ষ্যে আমাদের মাঝে অন্য ছেলে বন্ধুকে প্রেমের অফার করাতে সেও লুফে নেয়। তাদের এখন নিয়মিতই ডেটিং হয়।

সবশেষে আমি না পারি তাদের সঙ্গে সম্পর্কটা পুরোপুরি শেষ করতে না পারি সম্পর্ক বজায় রাখতে। কেননা, কথা দিয়ে যারা কথা রাখে না তারা তো আর বন্ধু হতে পারে না। চিন্তা করি ওই তিনচার জনের জন্য বাকিদের সঙ্গে কেন খারাপ আচরণ করবো।

লেখাটি এখানেই শেষ করতে পারতাম। কিন্তু একটি ঘটনা শেষ করতে দিল না। ছেলে বন্ধুর মধ্যে আমি এবং অপর একজন।

হঠাৎ করে চট্টগ্রাম শহরে যাই। তার কাছে ফোন করাতে সে বাসায় যেতে বললো, কি জরুরি কথা আছে। পরের দিন যাওয়ার পর সে জানালো কুষ্টিয়ার কিছু বন্ধুর কাছে (যাদের আমার মাধ্যমে তার সঙ্গে পরিচয়) টাকা পাবে। সে কিছুদিন আগে কুষ্টিয়ায় যাওয়াতে তখন তারা টাকাটা ধার নেয় এবং এক সপ্তাহ পরে ফেরত দেয়ার কথা, কিন্তু এখনো দেয়নি। তাই আমি যেন উদ্ধার করার ব্যবস্থা করি। কারণ তার কিছুদিন পরেই ২৪ তারিখে চায়না, নেপাল ও ভারতে ভ্রমণে যাওয়ার কথা। টাকাগুলো না পেলে তার যাওয়া হবে না। আমাকে অনেক কষ্ট করে রাজি করায়। ওই দিনই কুষ্টিয়ার উদ্দেশে রওনা দিলাম। কেননা দেখলাম সব ডকুমেন্টস তার রেডি শুধু টাকাগুলো পেলেই যেতে পারবে।

কুষ্টিয়া যাওয়ার পর টাকা ফেরত দেয়ার জন্য বন্ধুরা কিছু সময় চেয়ে নিল। আর সে রাজি হয়ে গেল আমার হস্তক্ষেপ ছাড়াই। আবার এও বললো, কিছু টাকা তারা আপাতত ঢাকা থেকে ম্যানেজ করে দেবে। এ জন্য তাদের মধ্যে থেকে একজন আমাদের সঙ্গে আসবে।

যথাসময়ে রওনা দিলাম তিন বন্ধু। আনন্দ করতে করতে চলে আসছি। যখন গাবতলী পৌছলাম তখন একদল র‌্যাব আমাদের গাড়ি তল্লাশি করবে। কারণ তারা তথ্য পেয়েছে আমাদের গাড়িতে ফেনসিডিল আছে। যখন সবাই একে একে নেমে যাচ্ছে তখন সঙ্গে থাকা অপর বন্ধুটি কৌশলে আগে নেমে পালিয়ে গেল। কারণ সে জানে আমার সঙ্গের বন্ধুটির ব্যাগেই আছে ওই অবৈধ জিনিস।

তার পরই তাকে ধরে ফেললো র‌্যাব। আমি না জেনে বন্ধুকে বাচাতে গিয়ে নিজেও ধরা খেলাম। আর এরপর থানা। থানা থেকে কোর্ট, কোর্ট থেকে জেলে। শেষে বন্ধুকে ভালোবেসে জেলখানাতেও থাকতে হলো।

যখন ষোল দিন পর বাড়িতে এলাম তখন সে এবং তার ফ্যামিলির সবাই দোষারোপ করলো আমাকে। আমার জন্যই নাকি আজ তার এ পরিণতি। অথচ সে তারও এক বছর আগে থেকে ফেনসিডিলের ব্যবসা করে যাচ্ছে যা পরে শুনলাম।

তাহলে আমি কাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলাম যা নর্দমার কীটগুলোর থেকেও নিকৃষ্ট।

...অতঃপর বন্ধু থেকে শত্রু।

নামঠিকানা বিহীন, চট্টগ্রাম থেকে

বৌ বনাম স্বাধীনতা

প্রাইমারি স্কুলে পড়ার সময় গদ্য বা কবিতার শেষে যে নতুন শব্দের অর্থ দেয়া থাকত তা মুখস্থ করতে হতো। যেমন চন্দ্র–চাদ পড়তে হতো। *চন্দ্র মানে চাদ*। শিক্ষক মহোদয়রা বলতেন, পরীক্ষায় *চন্দ্র* আর *চাদ* এলে লিখবা *চন্দ্র*। মনে মনে বলতাম ভালোই তো বুদ্ধি, এক মুখস্থেই দুই উত্তর। আসলে কি তাই? আমরা ঈদ সামনে এলে বলি ঈদ মানে খুশি। কিন্তু খুশি মানে কি ঈদ? কাউকে যদি *তোমাকে আজকে খুব খুশি খুশি লাগছে* এ কথার পরিবর্তে বলেন *তোমাকে আজকে খুব ঈদ ঈদ লাগছে।* কেমন শোনাবে! অনুরূপভাবে আমরা বলি বিয়ে মানে আনন্দ, কিন্তু আনন্দ মানে কি বিয়ে? কাউকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে গিয়ে যদি বলেন, আপনাকে আনন্দ (বিয়ে) করতে চাই? তাহলে আপনার মাথায় ভালো একটা মুগুর উপহার জুটবে এতে খুব একটা সন্দেহের অবকাশ নেই।

ভাবছেন গল্পের নাম *বৌ বনাম স্বাধীনতা* এর সঙ্গে এগুলোর সম্পর্ক কি? আসছি আসল কথায়। ভাইয়েরা, বোনেরা, শ্যালিকারা, দুলাভাইয়েরা, ভায়রারা, ভায়রা–পত্নী একটু অপেক্ষা করুন, বলে না সবুরে মেওয়া

ফলে। তবে আমি কখনো সবুরে মেওয়া খেতে পারিনি, যতক্ষণ বাজার থেকে কিনে অথবা গাছ থেকে পেড়ে না নিয়ে এসেছি। আপনারা খেতে চাইলে এখনি কিনে বা গাছ থেকে নিয়ে আসতে পারেন আমি একটু অপেক্ষা করছি, সবুরে মেওয়ার জন্য অপেক্ষা না করাই উত্তম। কি থেকে কি লিখছি! আসল কথা লিখতে ভয় পাচ্ছি, এই জন্য দেরি করছি। আর ভয় পাওয়ার কারণ হল, স্বাধীনতার অভাব, যথেষ্ট স্বাধীনতার অভাব, স্বাধীনতার অত্যন্ত অভাব, যাকে বলে স্বাধীনতার মঙ্গা চলছে।

ভাবছেন, আমাকে আবার বুশের ইরাক দখলের মতো দখল করলো কে? হ্যা আমাকে কেউ দখল করেছে, আমার স্বাধীনতা লুণ্ঠন করেছে, আমাকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছে, যার জন্য এত কথা। বুশ ইরাক দখল করেছে বেআইনিভাবে, জাতিসংঘের অনুমোদন ব্যতিরেকে, তবে আমাকে যে দখল করেছে সে নাকি আইন অনুযায়ী করেছে, জাতিসংঘের (পিতা-মাতার) অনুমোদন নিয়েই করেছে। সামলান এবার ঠেলাটা! এবার দখলকারীর নাম বলি যা শোনার জন্য আপনারা খরগোসের মতো কান খাড়া করে আছেন। দখলকারী হচ্ছে আমার *ছোট্ট একটা লম্বা বৌ*। ভাবছেন আমার অনেক বৌ! আমাকে সন্দেহের চোখে দেখছেন? বুঝেছি, বিশেষণগুলো ব্যাখ্যা না করলে আপনাদের সন্দেহ দূর হবে না। *ছোট্ট* বললাম এই জন্য যে আমার বৌটা আমার চেয়ে বয়সে একটু ছোট আর একটা বললাম এই জন্য যে আমার একটাই মাত্র বৌ, কতজনের কতটা থাকে! আর লম্বা বললাম এই কারণে যে, আমার বৌ সব সময় দাবি করে যে সে আমার চাইতে একটু লম্বা। কিন্তু লম্বা দাবি করলেই তো আর লম্বা হওয়া যায় না, লম্বা হতে হলে অবশ্যই টল হতে হয়। যাক বলছিলাম, বৌ কেন দখলদার হলো, কিভাবে হলো, কত প্রকারে হলো, উদাহরণসহ শুরু থেকে শুনুন (পড়ুন)।

প্রথমে বলেছিলাম, বিয়ে মানে আনন্দ। তাই বিয়ের আসরে মনে মনে একটু ভয় থাকায় বিয়ে মানে আনন্দ, বিয়ে মানে আনন্দ এই দোয়া পড়ে হাজারোবার বুকে ফুক দিয়েছিলাম (একেবারে মিথ্যা কথা) যাকে বিয়ে মানে আনন্দের পরিবর্তে কানন্দ না হয়। একশ ভাগ কাজ হয়েছিল। ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, আপনারা যারা বিয়েতে ভয় পান অর্থাৎ বিয়েভীতু বা বিয়ে-দুর্বল হার্টের মানুষ, তারা প্রতিরাতে শোয়ার সময় এই দোয়া পড়ে বুকে ফুক দেবেন; দেখবেন, লাজলজ্জা হারিয়ে বেলজ্জার মতো শিগগিরই বিয়ের পিড়িতে সলজ্জভাবে বসে গেছেন, তারপর দেখবেন ছোটখাট একটা সুন্দরী ঘরণী ঘরে ঘুরঘুর করছে, মনের পতাকা বিনা বাতাসে পতপত করে উড়ছে, তখন আপনার সাক্ষাৎ পায় কে?

বিয়ে মানে আনন্দ অথচ আমার বৌ বিয়ের আসরেই বিশাল একটা কান্না জুড়ে দিল, আকাশ বাতাস কান্নায় স্তব্ধ করে দিল, হয়তো এই দোয়া জানতো না এই জন্য। আমার শাশুড়ি আম্মাও তার মেয়ের গলা ধরে কান্না শুরু করলেন, দুইজনের কান্নায় কান্নার অনুনাদ সৃষ্টি হতে লাগল, যদিও দুইজনের কান্নার ধরন, বিবরণ, নিরসন, ফ্রকোয়েন্সি ও উদ্দেশ্য আলাদা। অনেক বরযাত্রী, কনেযাত্রী, মধ্যযাত্রী, কেউ বুঝে, কেউবা না বুঝে, কে বা সবাই কাদছে না কাদলে কেমন দেখায় এই লজ্জায় কেদে আমার বৌকে সহায়তা করল, মানে আমার বৌয়ের কান্নার কাজটা সবাই মিলে করে দিল যাতে সময় কম লাগে। একেই বলে দশে মিলে করি কাজ, কাদি তবু নাহি লাজ, দশ মিনিটের কাজ এক মিনিটে।

এবার শুনুন বৌ নিয়ে আসার পর কি কি স্বাধীনতা পদদলিত হলো।

এক. বিয়ের আগে যখন ইচ্ছে তখন বগল বাজাতে বাজাতে বাসায় ফিরতাম আর এখন সন্ধ্যার আগেই বাসায় ফিরতে হয়। না হলে ঘরে কালো পতাকা অর্ধনমিত অথবা পূর্ণনমিত থাকে। শোকে নীরবতা পালন করা হয়, যেমনটি করা হয় একুশে ফেব্রুয়ারিতে। তবে একুশে ফেব্রুয়ারিতে একটা টাইম লিমিট থাকে, এক মিনিট বা দুই মিনিট, ওই টাইমের পরে সবাই নড়েচড়ে কথা বলা শুরু করে, যেমন সবাই এক সঙ্গে নতুন জীবন ফিরে পেল আর আমার ক্ষেত্রে টাইমের লিমিট থাকে না, কালো পতাকা শাদা হয় না। এই কালো পতাকা শাদা করার জন্য কত কি যে করি, যেটা জানি সেটা করি, যেটা জানি না সেটাও করি ট্রায়াল অ্যান্ড এরর পদ্ধতিতে। কখনো কাজ হয়, কখনো হয় না, কখনো আবার দুটোই হয়।

দুই. আগে অফিস থেকে বাসায় আসার সময় কতজনের বাসায় উঠেছি, কত জায়গায় ঘুরেছি, দশ মিনিটের পথকে এক ঘণ্টার পথ বানিয়েছি। আর এখন অফিস থেকে সোজাসুজি বাসায় আসতে হয় শর্টকাট পদ্ধতিতে। অফিস থেকে আসতে একটু দেরি হলে আমাকে কৈফিয়ত দিতে হয় আমি কোথায় কোথায় গিয়েছিলাম কিংবা আসার সময় রাস্তায় দাড়িয়ে কোনো (মেয়ের) দিকে হা করে তাকিয়েছিলাম কি না? বাসায় এসে বাসায় বন্দি হয়ে যাই, যেন সেই গান গাইতে ইচ্ছে করে *আমি বন্দি কারাগারে..., বৌই আমার সম্বল, বৌই আমার কম্বল*।

তিন. অফিসে বৌয়ের টেলিফোন রিসিভ না করলে কৈফিয়ত দিতে হয় ওই সময়ে কোথায় ছিলাম, কেন সেথায় ছিলাম, কতক্ষণ ছিলাম, কি করছিলাম, কিভাবে গেলাম, কিভাবে এলাম, রাস্তায় কার কার সঙ্গে দেখা হলো, কি কথা হলো ইত্যাদি ইত্যাদি, হানিফ সংকেতের ইত্যাদি।

চার. বৌয়ের কানে, নাকে, গলায়, হাতে, পায়ে, মুখে, চোখে, ঠোটে, আঙুল কিংবা কপালে কখন কি অলংকার পরেছে তা আমাকে প্রতি ঘণ্টায় ঘণ্টায় খেয়াল রাখতে হয়। শুধু খেয়াল করলেই হয় না, মনেও রাখতে হয়, কারণ বৌ মাঝে মধ্যেই জিজ্ঞাসা করে, সকালে বা দুপুরে কিংবা অমুক সময়ে অমুক অঙ্গে কি পরেছিল, কতক্ষণ পরেছিল, কালার কি ছিল? উত্তর না দিতে পারলে ফেল মার্ক তো পাই, সঙ্গে বোনাস হিসেবে পাই অভিমান, আমি কেন তার দিকে তাকাই না, খেয়াল করি না। বলি, মেয়েমানুষের দিকে তাকানো কি খুব ভালো কথা। তখন কি বলে বুঝতেই পারছেন।

পাচ. তরকারিতে যতই ঝাল বা লবণ হোক না কেন, বলতে হয় *রান্না বেশ মজা হয়েছে*। যে দিন ঝাল বা লবণের মাত্রা সীমা অতিক্রম করে অসীম হয়ে যায়, সেদিন বৌ নিজে থেকেই বলে আজকে ঝাল বা লবণ একটু বেশি হয়ে গেছে, তাই না? আমি উত্তর দিই, আসলে তোমার দোষ নেই, ঝাল বা লবণ বেশি হয়নি, সবজি কম হয়েছে; মানে বোঝাতে চাই যে, সবজি পরিমাণে একটু বেশি হলে লবণটা ব্যালান্স হয়ে যেতো। আমি যে সবজি বেশি পরিমাণে কিনি নাই, এটাতো আমার দোষ। বৌ মনে মনে খুশি হয়। ঠোটে হাসির ঝিলিক দেখা যায়।

ছয়. রাস্তায় বৌকে সঙ্গে নিয়ে হাটলে, বৌ রাস্তার দিকে তাকায় না, অন্য মানুষের দিকে তাকায় না, গাড়ি ঘোড়ার দিকে তাকায় না, কোনো শপিং মলের দিকে তাকায় না, শুধু আমার দিকে, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ভাবছেন এ রকম বৌ আর কয়জনের ভাগ্যে জোটে। কিন্তু কেন তাকায় জানেন? বৌ আমার দিকে তাকিয়ে থাকার কারণ হলো আমি কোন দিকে কোন মেয়ের দিকে তাকাচ্ছি তা ফলো করে (অবশ্যই বিদেশে)। প্রশ্নবিদ্ধ হই, কেন রাস্তার দিকে না তাকিয়ে, ডানে, বামে বা সামনে প্রয়োজন মতো (?) তাকাচ্ছি? আমি ব্যাখ্যা দিই, ডানে বা বামে এই জন্য তাকাই যে কোনো মেয়ের সঙ্গে বুকাবুকি ধাক্কা যেন না লাগে। কিন্তু বৌ না শুনে ধর্মের কাহিনী। আমার বৌ এতো সুন্দর একটা যুক্তি কোনো মতেই বিশ্বাস করতে চায় না। কোনো মেয়ের সঙ্গে ধাক্কা লাগার মতো অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার আগেই দশ নম্বর সতর্ক সংকেত কানে ভেসে আসে বৌয়ের মুখ থেকে। আর একবার যদি কোনো রকমে ধাক্কা লাগে, তাহলে চোখ রাঙানি এবং তর্জনীর আস্ফালন এককভাবে বা যুগপৎভাবে অঝোরে আমার ওপর বর্ষিত হয়। যেন ধাক্কা আমিই মেরেছি শুধু?

সাত. আমার মোবাইল মাঝে মধ্যেই রেইড করা হয় বিনা নোটিসে, কোনো মেয়ের নাম্বার আছে কি না দেখার জন্য। নাম্বারের তো আর লিঙ্গ হয় না, ফলে নাম্বার দেখে ছেলে না মেয়ে কি করে বুঝবে? মেয়েদের নাম্বার ছেলের নাম দিয়ে সেভ করি। থুক্কু, মেয়েদের নাম্বার থাকলে আমি মুছে দিই। না থুক্কু, মেয়েদের নাম্বার আমিই নিই-ই না।

আট. দুইজনে ভাত খাওয়ার সময় যে ভাত বা তরকারি বেশি হয় সেটুকু আমাকেই খেতে হয় পাতিল খালি করার জন্য। কোনো উপায় থাকে না, পেটে জায়গা না থাকলেও, বিনীত অনুরোধে পেটে জায়গা হয়ে যায়।

এবার আপনারা বলেন, আমি এই ধরণীতে কতটুকু স্বাধীনতা নিয়ে বেচে আছি। মাঝে মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দিই, সংগ্রাম, সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম। কিন্তু বাসায় এসেই যখন বেড়ে রাখা ভাত খেতে পাই, খাওয়ার সময় পাশে বসে যখন ভাত, তরকারি আমার প্লেটে তুলে দেয়, সময়ে অসময়ে একটু আদর করে, তখন স্বাধীনতার ডাকটা ছোট হয়ে আসে, আস্তে আস্তে সংগ্রামের ডাকটা হারিয়ে যায়, জীবনটা মনে হয় এ রকমই হয়।

কখনো কখনো ভাবি, ভাবতে ভাবতে উদাস হয়ে যাই, উদাস ভাবটা গভীর থেকে গভীরতর হয়, মনটা চলে যায় বনের গভীরে, বৌটা আমার কেন এ রকম করে! উত্তর বেরিয়ে আসে, বৌয়ের আমার প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসাই হচ্ছে প্রধান কারণ, যেন অন্যের নাম না করি উচ্চারণ, মেনে চলি একটা আদর্শ ব্যাকরণ। তাইতো বৌকে ভালোবাসা দিবসে মনের হরষে, সরষে ফুলের পুরো এক বোতল বায়বীয় সুবাস উপহার রইলো।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, হংকং থেকে

বাবা

বাবা, যদি তুমি মরেই যাবে তবে কেন অপরিচিতদের মাঝে আমাকে একলা ফেলে চলে গেলে! তোমার মতো এতো আদর এই পৃথিবীর কেউ কোনোদিন আমাকে করেনি। যেদিন তুমি বড় বেশি অভিমান করে আমাকে ছেড়ে পরপারে গেলে তখন থেকে খুব একা হয়ে গেছি। আমার নসিবটা এতো মন্দ কেন বাবা! আমার কেন পৃথিবীর কোথাও ঠাই নেই! আমি কি অবাঞ্ছিতা হয়ে জন্মেছিলাম? জানো বাবা, রুবি বেনী খুব সুখী। আমি তাদের হিংসা করি না। তারা আমার সঙ্গে কম মেশে। আমার স্বামীটা খুব গরিব। বাচ্চাদের এক তিল মাটিও নেই। বাবা, আমি বছরে একবার যাই বাড়িতে। ভাইয়েরা খুব রাগারাগি করে। বেশিদিন থাকার ইচ্ছা ভয়ে লুকিয়ে রেখে পাচ-ছয় দিন থেকে চলে আসি।

বাবা, আমার কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। দুই ছেলে আমার। তাদের নিয়ে একাকিত্বে গুমরে মরি। বাবা, বেনী তো খুব ধনীর বৌ, তাই আমার এবং আমার বাচ্চাদের ওই বাড়িতে যাওয়ার হুকুম নেই। তারা দুই বোন, ফোনে ডেইলি কথা বলে। তাদের মোবাইল আছে অথচ শখ হলেও টাকার জন্য তাদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয় না। রুবি ব্যস্ত খালাদের নিয়ে।

বাবা, আমার যাওয়াটা কেন জানি মা-ও পছন্দ করেন না। পাচ-ছয় দিন থাকলে তিনি উল্টা-পাল্টা আচরণ করেন। মা তো একটা শাকও আমাকে দিতে চান না। বাবা, আমাকে এক ফোটা দোয়াও কেউ করে না। তুমি কিন্তু তোমার নিয়তের মালুজাকে দোয়া করো বেনুর জিসার মতো একটা মেয়ে যেন খোদা আমাকে দেন। আজ তোমাকে কিছু লিখতে পেরে দুঃখটা ঘুচলো। তোমার রোজী।

ঠিকানা বিহীন

অমলবাবুর বাজেট শিক্ষা

ইফতেখার হোসেন বাবু

রামগঞ্জ হাই স্কুলের অংকের স্যারের নাম অমলবাবু। বয়স পঞ্চাশ হবে। গাবদা-গোবদা টাইপ মানুষ। সাধারণত অংক স্যারদের মাথায় চুল থাকে না। অমলবাবুর মাথা ভর্তি চুল। নাপিতকে তিনগুণ টাকা না দিলে এলাকার কোনো নাপিত অমলবাবুর চুল কাটতে রাজি হয় না।

অংক স্যারদের সাধারণত অংকের দিকে প্রচণ্ড আগ্রহ থাকে। তাদের প্রিয় অংক হয় তেলমাখা বাশ বেয়ে বানরের ওঠার অংক। লম্বা একটি বাশ। ভালো করে তেল মাখানো। একটা বানর সেই বাশে উঠতে চাচ্ছে, দুই হাত উঠে পিছলে এক হাত নেমে যাচ্ছে। এই হচ্ছে অংক। মহা গুরুত্বপূর্ণ এই অংক করানোর প্রতি অমলবাবুর কোনো আগ্রহ নেই। তিনি ক্লাসে এসে ছাত্রদের ইতিহাস পড়ান। ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে গলা

ছেড়ে গান গাইতে থাকেন। মাঠে গিয়ে হাডুডু খেলেন। গাবদা–গোবদা শরীর নিয়ে তিনি অবশ্য ছাত্রদের সঙ্গে হাডুডু খেলায় পেরে ওঠেন না। তবুও খেলেন।

অমলবাবু নিতান্তই গরিব। স্কুল থেকে সামান্য বেতন পান। তার খুব ইচ্ছা, প্রতি মাসে একবার ছাত্রছাত্রীদের খাওয়ানো। কিন্তু সামান্য বেতনে পেরে ওঠেন না। আশায় থাকেন বাজেটে সরকার শিক্ষকদের বেতন সম্মানজনক করবে। প্রতি বছর তিনি গভীর আশা নিয়ে বাজেট অধিবেশন শোনেন। একটা রেডিও আছে। সেই রেডিওতে অর্থমন্ত্রীর বাজেট ভাষণ শোনেন। বেতন বাড়া মাত্রই তিনি সব ছাত্রছাত্রীদের খাওয়াবেন। গরিব ছেলেমেয়েরা কি যে খুশি হবে!

বাজেট অধিবেশন শেষ হওয়া মাত্রই তার মুখটা কালো হয়ে যায়। ছোট একটা জীবন। শেষ হয়ে আসছে। ছোট কিছু স্বপ্ন। শিশুদের আনন্দময় মুখ দেখা। হয়তো এ জীবনে হয়ে উঠবে না।

আজ অমলবাবুর মন খারাপ। ভয়াবহ রকম খারাপ। হেডস্যার তাকে কিছু কথা শুনিয়েছেন। অমলবাবু কমনরুমে বসে লিখেছিলেন বাজেটের ওপর লেখা। অমলবাবু ঠিক করেছেন বাজেটের ওপর একটা বই লিখবেন ছোটদের জন্য। শিশুরা সে বই পড়বে, জানবে বাজেট কি, কিভাবে হয়। অমলবাবুর ধারণা, শিশুরা যদি বাজেট সম্পর্কে জানে তাহলে খুবই লাভ হবে। বাজেট করার সময় শিশুরা যখন বড়দের দিকে গভীর মায়াভরা চোখে তাকিয়ে বলবে, আমাকে এটা দাও, ওটা দাও..., তাদের কথা কেউ ফেলতে পারবেন না সে যতো বড় রাজনীতিবিদই হোন না কেন।

হেডস্যার ঘরে ঢুকে বললেন, অমলবাবু, কি লিখছেন?

স্যার, একটা গ্রন্থ রচনা করছি। বাজেটের অ আ ক।

হেডস্যার খড়খড়ে গলায় বললেন, অমলবাবু কিছু মনে করবেন না, আপনার মাথার স্ক্রুগুলো বোধহয় গেছে! দয়া করে একটু মাঠে যান। পিটিস্যার আসেননি। ছাত্রছাত্রীরা হই চই করছে। তাদের একটু পিটি করান।

অমলবাবু মাঠে গেলেন। তিনি অংকের শিক্ষক। পাচ বছর আগে তিনি অংকের *ডিঙি নৌকা* উপাধি পেয়েছিলেন। তাকে কি না পাঠানো হয়েছে পিটি করাতে! সে জন্য অবশ্য তিনি রাগ হননি। বাজেট নিয়ে কটু কথা বলায় রাগ হয়েছেন। মানুষের জীবনে বাজেট কি যে গুরুত্বপূর্ণ, হেডস্যার কি সেটা বোঝেন না! আশ্চর্য! বাসা, স্কুল থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায় প্রত্যেকটা জায়গায় বাজেট কতো গুরুত্বপূর্ণ।

পিটি ক্লাসে সব ছাত্রছাত্রীরা আসে।

অমলবাবু দেখলেন এই সুযোগ। সবাই আছে। প্রতিদিন পিটি করানোর দরকার কি! সবাইকে বাজেট কি তা শেখানো যাক। বাজেটের ওপর তিনি একট ছোটখাটো বক্তব্য দিয়ে ফেললেন। বাজেট যে শুধু জাতীয় পর্যায়ে না, ব্যক্তি পর্যায়েও হতে পারে তা বুঝিয়ে দিলেন। ঠিকমতো বাজেট করে চলতে পারলে ভবিষ্যতে যে ভালো ফল পাওয়া যায় তা বোঝালেন। কালো টাকা কি বোঝালেন। তার খুব তৃপ্তি হতে লাগলো। শেষে অবশ্য তার একটু মন খারাপ হলো।

ছাত্রছাত্রীরা খুব হাসি মুখে তার কথা শুনছিল।

তিনি শেষ দিকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি রে, বাজেট সম্পর্কে জানতে পেরে তোরা খুব মজা পাচ্ছিস না?

না স্যার, আসলে পিটি করতে না হওয়ায় আমরা খুব মজা পাচ্ছি।

একজনকে পড়া ধরলেন। বলতো কালো টাকা কি?

সে থতমত খেয়ে বলে উঠলো, স্যার, বোধহয় টাকায় কালি লাগলে তখন টাকাকে কালো টাকা বলে।

পিটি ক্লাস শেষে তিনি কমনরুমে এসে বসলেন।

হেডস্যার এসে থমথমে গলায় বললেন, অমলবাবু আপনার পিটি করানো দেখলাম।

পিটি তো করাইনি স্যার! বাচ্চা ছেলেমেয়ে! একদিন রেস্ট নিক।

তাই বলে আপনি তাদের বাজেট পড়াবেন? তারা বাজেটের বোঝে কি?

বোঝে না, বুঝবে।

আপনার মাথা বুঝবে। আমার ধারণা, আপনার মাথা গেছে।

মাথা যায়নি স্যার। ঠিক আছে।

আপনি বললে তো হবে না। সবাই বলাবলি করছে। সবাই আপনাকে নিয়ে হাসাহাসি করছে।

ভালো তো স্যার। হাসাহাসি করলে মন ভালো থাকে। আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে মন ভালো থাকছে। এতে আমার পুণ্য হচ্ছে।

শোনেন অমলবাবু, আপনি চলে যাওয়ার পর আপনার ডায়রিতে বাজেট নিয়ে লেখা আমি পড়েছি–

বাজেট কি শিশুরা তাহা পড়ো মনোযোগ দিয়া

বাজেটে চলে দেশ, বাজেট দিয়ে বিয়া।

এসব কি যা–তা লিখছেন?

যা–তা কোথায় স্যার? ছন্দের মাধ্যমে লেখা। শিশুদের কঠিন জিনিস ছন্দের মাধ্যমে শেখাতে হয়।

অমলবাবু, আপনি সাত দিন ছুটি নিন। আপনাকে সাত দিনের ছুটি দেয়া হলো। বাসায় গিয়ে শুধু বিশ্রাম নেবেন, কোনো লেখালেখি না। আপনার ডায়রি আমার কাছে রইলো। আপনাকে বিশেষ স্নেহ করি। তাই বোর্ড মিটিংয়ে আপনার ব্যাপারটা এখনি তুলতে চাই না। প্রয়োজনে পনেরো দিন, এক মাস বিশ্রাম নিন।

হেডস্যার থমথমে মুখে চলে গেলেন।

অমলবাবুর খুব মন খারাপ হলো। হেডস্যার যে তাকে বিশেষ স্নেহ করেন তা তিনি জানেন।

অমলবাবু পনেরো দিনের জায়গায় এক মাস ছুটি কাটালেন। এই এক মাসে আরেকটি ডায়রি কিনে পুরো বাজেট তিনি ছন্দে ছন্দে লিখে ফেলেছেন।

সরকার প্রতি বছর বাজেট করে পাস

বাজেটের পর পর শুরু হয় হাস–ফাস

ছন্দ তেমন স্ট্রং না, তা নিয়ে তিনি চিন্তিত নন। তিনি তো ছন্দের জাদুকর নন। তাছাড়া ছোটরা বুঝতে পারছে, মজা পাচ্ছে। তাতেই হলো। তার প্রিয় কয়েকজন ছাত্রছাত্রী প্রতিদিন দেখা করতে আসে। গভীর আগ্রহ নিয়ে তারা ছন্দে ছন্দে বাজেট পড়ে।

এক মাস কি কারণে যেন স্কুলের বেতন হলো না আর এ সময় হেডস্যার অসুখে পড়লেন, কঠিন জ্বর। ডাক্তার ওষুধ দিলেন। বেতন পাননি। ওষুধ কেনার টাকা নেই। হেডস্যার চোখে অন্ধকার দেখলেন।

অমলবাবু তার প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে হেডস্যারকে দেখতে গেলেন।

হেডস্যার জ্বরের মাঝেও অমলবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার মাথা ভালো হয়েছে?

অমলবাবু হেসে ফেললেন। স্যার, আপনার জন্য ওষুধ নিয়ে এসেছি।

হেডস্যার অবাক হলেন, আপনিও তো বেতন পাননি।

আমার টাকায় আনিনি।

তাহলে?

আপনার ছাত্রছাত্রীরা ফয়সাল, তাশফিক, সিমি, সোনিয়া, শিশির... সবাই এখন প্রতি মাসে বাজেট করে চলে। বাজেট করে টিফিনের টাকা থেকে তারা সঞ্চয় করেছে।

জি স্যার। রাহাত বললো। আপনার অসুখ শুনে আমরা সবার জমা টাকা দিয়ে আপনার জন্য ওষুধ কিনে এনেছি। স্যার উঠে বসুন, আমি পানি নিয়ে আসছি। আপনাকে এখনি ওষুধ খেতে হবে।

হেডস্যার উঠে বসলেন। তার সামনে এতোজন, অথচ তিনি কাউকে ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছেন না। কারণ তার চোখ ভর্তি জল। আনন্দের জল।

econo_iftekher@yahoo.com

গভীর

- রীমা

সারা রাত শবে বরাতের নামাজ পড়ে ফজরের নামাজ শেষে বিছানায় শুয়ে তন্দ্রার মতো আসতেই মোবাইলটা বেজে উঠলো। হাত বাড়িয়ে ফোনটা রিসিভ করতেই ওপাশ থেকে ভেসে এলো, কি ফজরের নামাজ পড়েননি?

রীমা মানে আমি, কিছু না বুঝেই ঘুমের ঘোরে উত্তর করলাম, হ্যা, পড়েছি তো। আপনি?

ওপাশ থেকে উত্তর এলো, আমি, আমি সেই *মিসকল*।

আমি হেসে ফেললাম।

তারপর সে বললো, ঘুমান।

ফোন রেখে দিলাম কিন্তু ঘুমাতে পারলাম না। তার হ্যালো বলাটা অন্যরকম। শুধু শুনতেই ইচ্ছা করে।

পরদিন সে ফোন করলো। কথা বললাম। আমিও ফোন করলাম, সে কথা বললো। এভাবেই আমাদের সম্পর্কের সূচনা।

আজ তাকে পাগলের মতো ভালোবাসি। সে বাসে কি না বলতে পারবো না! তবে যতোটুকু বুঝতে পারি সেও আমাকে ভালোবাসে। আমাকে এই বন্দিত্ব থেকে মুক্ত করে নিয়ে যেতে চায়। কি সুন্দর করে সে ভালোবাসার কথা বলে তা লিখে কাউকে বোঝাতে পারবো না।

সে বলে, রীমা লক্ষ্মী, জীবনে তো কোনোদিন ভালোবাসা পাওনি। তোমাকে ভালোবাসা দেবো, আদর দেবো। এক বুকভরা ভালোবাসা আর আদর তোমার জন্য জমা করে রেখেছি। তোমাকে কোনোদিন কষ্ট দেব না। শুধু ভালোবাসবো আর আদর দেব। আরো কতো যে কথা। আমাদের দেখা হয়নি। অর্থাৎ কেউ কাউকে দেখিনি কিন্তু না দেখে যে এমন গভীর ভালোবাসা হয় তা আমার কাছে সত্যিই আশ্চর্য লাগে।

সে সব কথা জানে। আমার জীবনে ঘটে যাওয়া প্রতিটি কথাই তাকে বলেছি। বলেছি আর কেদেছি। আমার সঙ্গে সেও কেদেছে।

উচ্চশিক্ষিত এক সরকারি অফিসারের সঙ্গে বাবা-মা আমাকে বিয়ে দেন বয়স যখন সতেরো। এইচএসসি পাস করেছি। দুজনের বয়সের পার্থক্য অনেক। বাবা-মা সরকারি বড় অফিসার পেয়ে হাতে আকাশের চাদ পেল মনে হয়। কিন্তু বিয়ের পরদিন থেকেই বুঝতে পারলো, তারা কি পেয়েছে।

আমার বর বিয়ের পরদিনই খুব খারাপ ব্যবহার করে তাদের বাড়ি চলে গেল।

এখানে বলে রাখা ভালো, আমার বিয়ে হয় কনে দেখতে এসে। অর্থাৎ দেখতে এসে আমার বাবার টাকা-পয়সা দেখেই বিয়ে করতে সে রাজি হয়। বিয়ের পর তাদের চাহিদা অনুযায়ী কনের গহনা থেকে শুরু করে ঘরের ফার্নিচার, আসবাবপত্র, থালাবাসন সব কিছু দেয়া হয়। আমার স্বামী যেন কিছু বলতে না পারে এ জন্য বাবা-মায়ের দেয়ার মধ্যে কোনো কার্পণ্য ছিল না। তারপর আবার প্রথম মেয়ে। কিন্তু তার মন পাওয়া গেল না।

বিয়ের পরপরই অন্তঃসত্ত্বা হই। ছয় মাসের সময় আমাকে তার কর্মস্থল ঢাকায় নিয়ে আসে। শুরু হলো আমার দুঃসহ যন্ত্রণাময় বন্দী জীবন। সে যখন অফিসে যেতো বাইরে থেকে তালা দিয়ে চাবি অফিসে নিয়ে যেতো। উহ! কি যে কষ্ট। গ্রাম থেকে আসা সহজ, সরল, বোকা একটা মেয়ের ওপর কি যে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করতো, তা লিখে বোঝাতে পারবো না। কারো সঙ্গে মিশতে দিতো না, কথা বলতে দিতো না।

তারপরও জানালা দিয়ে পাশের বাসার খালাম্মাদের সঙ্গে চুপি চুপি কথা বলতাম।

একবার গেইট খুলে এক খালাম্মার সঙ্গে গল্প করছি এমন সময় সে অফিস থেকে চলে আসে। এসেই গেইট লাগিয়ে দেয়। আমার শত অনুরোধ, কান্নাকাটিতেও সেদিন গেইট খোলেনি। দুই ঘণ্টা গেইটের সামনে

দাড়িয়ে কেদেছি কিন্তু সে গেইট খোলেনি। পরে ওর এক ভাবীর বাসায় যাই। রাতে ভাবী আমাকে বাসায় নিয়ে আসে।

অনেকেই হয়তো ভাববেন, এমন আচরণের কারণ কি? তার খুব ইচ্ছা ছিল ঢাকায় বাড়ি আছে, সুন্দরী, চাকরিজীবী এমন মেয়ে বিয়ে করার। কিন্তু বিধাতা আমার ভাগ্যকে পরিহাস করে হয়তোবা তার ভাগ্যের সঙ্গে আমাকে জুটিয়েছেন।

বিয়ে হয়েছে আজ সাত বছর। আমার একটি ফুটফুটে সন্তান আছে যার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি সব ভুলতে চেষ্টা করি। অনেক কষ্টে এমএ পাস করেছি। আমি যখন পড়াশোনা করেছি, সে তখন উচু স্বরে গান গেয়েছে, টিভির ভলিউম সর্বোচ্চ দিয়েছে, ক্যাসেট ছেড়েছে। এভাবে সে আমার পড়াশোনায় সাহায্য করেছে।

সাত বছরের বিবাহিত জীবনে কোনো সুখের স্মৃতি খুজে পাই না। বাবা-মা আমার কষ্টের সব কথা জানলেও, বুঝলেও সমাজের ভয়ে আমাকে এই ভয়ংকর কষ্টের মাঝেই ফেলে রেখেছে।

একটি চাকরি খুজছি। চাকরি পেলে হয়তোবা আমার সন্তান নিয়ে আলাদা একটা জগৎ তৈরি করে সুখ না হোক শান্তিতে থাকতে পারবো।

পচিশ বছরের এই মরুময় জীবনে ভালোবাসার ছোয়া পাইনি। তাই তার ফোনের মাধ্যমে ভালোবাসার কথাগুলো আমার ভেতরে মরু উদ্যানের সৃষ্টি করেছে।

ভালোবাসার কথায় সিক্ত হলেও তার সঙ্গে কথা বলতে পারছি না। সে খুব অসুস্থ। মাদ্রাজ গেছে চিকিৎসার জন্য। অসুস্থতার সময় তার পাশে না থাকতে পারলেও তার জন্য নফল রোজা রাখছি। নামাজ পড়ছি আর বিধাতার কাছে প্রার্থনা করছি- হে প্রভু আমার ভালোবাসাকে আর কষ্ট দিও না। তার সমস্ত যন্ত্রণা, কষ্ট আমাকে দিয়ে তাকে সুস্থ করে দাও। আমাকে এই পৃথিবী থেকে নিয়ে হলেও তাকে ভালো করে দাও।

তার প্রতি আমার যে ভালোবাসা, এটা কি অন্যায়? পাপ? আমি এটাকে অন্যায় মনে করছি না। কারণ আমি তো রক্তে মাংসে গড়া মানুষ। আমারও তো একটা মন আছে। স্বামী নামক ওই পশুর কাছ থেকে কখনো এতোটুকু সুখ বা শান্তির ছোয়া পাইনি, পেয়েছি শুধু কষ্ট আর মানসিক যন্ত্রণা।

তার সঙ্গে আমার ভাগ্যের মিল হোক আর নাই হোক, তাকে ভালোবাসি, ভালোবাসবো। সে যেন তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে দেশে ফিরে আসে।

ঢাকা থেকে

বাদি থেকে বেগম

– মীরা

মীরা আমার ছদ্মনাম।

দুঃখে গড়া ছিল আমার জীবন।

প্রথম আমাদের পরিবারে কোনো অভাব ছিল না। মোটামুটিভাবে চলে যাচ্ছিল।

তারপর মুক্তিযুদ্ধের সময় ইনডিয়া চলে গেলাম। সেখান থেকে অভাব আমাদের নিত্যসঙ্গী হলো।

এক সময় দেশ স্বাধীন হলে এসে দেখি সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেছে। এরপর থেকে অভাব আমাদেরকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। অভাবের তাড়নায় এক সময় পড়াশোনা ছেড়ে দিলাম।

চারদিকে তখন যুদ্ধ-উত্তর অস্থিরতা চলছে, ক্ষমতাসীনদের সোনার ছেলেরা যত্রতত্র অঘটন করে বেড়াচ্ছে। এক রাতে তারা আমাদের বাড়িতেও হামলা চালায়।

স্থানীয় মসজিদের ইমাম সাহেবের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে সে যাত্রা রক্ষা পেয়ে ছিলাম। ইমাম চাচা খুব মহৎ এবং উদার লোক ছিলেন। তাকে আমার সাক্ষাৎ দেবতা মনে হতো।

ইজ্জত রক্ষার্থে তাই বাবা খুব তড়িঘড়ি করে আমাকে পাত্রস্থ করেন। কিন্তু গরিব বাবার পক্ষে তখন যৌতুক দেয়া সম্ভব হয়নি। সে জন্য শ্বশুর বাড়িতে আমাকে অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করতে হয়। বাবার মলিন মুখ দেখে সব কিছু সহ্য করি।

অন্যদিকে স্বামী ছিল নিষ্কর্মা, মদ্যপ ও লম্পট। প্রায় রাতেই সে আমাকে মাতাল অবস্থায় মারধর করতো। দেখতে দেখতে তিন বছর চলে গেল, আমার কোনো সন্তান না হওয়াতে তারা আমাকে বন্ধ্যা অপবাদ দিয়ে তাড়িয়ে দিল।

আবার গরিব বাবার ঘাড়ে এসে পড়লাম। একে তো অভাবের সংসার তার উপর আবার আমি। বাবা দু চোখে আধার দেখতে লাগলেন।

আমাদের এ বিপদের দিনে আবার আলোর দিশা হয়ে এগিয়ে এলেন ইমাম সাহেব। তিনি আমাকে ঢাকাতে তার এক বড়লোক আত্মীয়ের বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

সেখানে ভালো বেতনে একটা চাকরি পেলাম। চাকরিদাতা সাহেবকে প্রথম দেখে তো আমি থ হয়ে গেলাম। যেমন সুদর্শন তেমন সদালাপি। মনে হলো যেন দেবতা।

এরকম পুরুষ যে কোনো মেয়ের আরাধ্য হতে পারে। যে কোনো মেয়ে প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ে যেতে পারে। কোনো রাজপুত্রও এতো সুদর্শন হয় কি না আমার সন্দেহ আছে।

বেগম সাহেবও খুব সুন্দরী। যেন রাজকন্যা। দুজনকে বেশ মানিয়েছে। যেন সোনায় সোহাগা।

সাহেব ও বেগম দুজনের মুখে সব সময় হাসি লেগেই থাকতো। দুজনই মাটির মানুষ। আমার সঙ্গে কখনও রাগ করতেন না।

যৌবনের শুরুতে যে রাজপুত্র স্বপ্নে দেখতাম, সাহেব আমার সেই *স্বপ্নে দেখা রাজপুত্র*। মনে মনে আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি।

আমার কাজ ছিল মূলত বেগম সাহেবের কাছাকাছি থেকে আদেশ পালন করা। বাহিরে কোথাও গেলে অনুগমন করা। এক কথায় বলা চলে আমি তার পার্শ্বচর ছিলেম।

সাহেব তার ব্যবসা নিয়ে সর্বক্ষণ দেশে-বিদেশে ব্যস্ত থাকতেন। সুতরাং বেগম সাহেবের ভালোমন্দ দেখাশোনা করা এবং সঙ্গ দেয়া আমার নিত্য দিনের কাজ হয়ে দাড়ায়।

ধীরে ধীরে আমি তাদের এতটা আস্থাভাজন হই যে, সে বাড়ির সব কাজের তত্ত্বাবধান আমার ওপর ছেড়ে দেন। এমন কি টাকা-পয়সার দায়িত্বও।

ছাত্রী হিসেবে আমি বরাবরই ভালো ছিলাম কিন্তু অভাবের জন্য পড়া হলো না এবং দেখতেও সুন্দরী ছিলাম। অনাহার ও সাবেক স্বামীর অত্যাচারে সে সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

এখানে এসে ভালো খাওয়া-থাকার ফলে এবং আনন্দঘন পরিবেশের জন্য আমার সৌন্দর্য আবার প্রস্ফুটিত হলো। আমার প্রতিভা এবং প্রজ্ঞা দিয়ে আস্তে আস্তে সবাইকে আপন করে নিলাম।

এ সময়ে বেগম সাহেবের সুপারিশে তার মিলে আমার দুই ভাইয়ের চাকরি হয়।

ধীরে ধীরে দেখলাম বেগম সাহেব আমার হাতে সাহেবের পরিচর্যার অনেক দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন। এভাবে আমি আমার স্বপ্নের রাজপুত্রের অনেক কাছে চলে এলাম।

এদিকে আমার ভাইয়েরা মিলে যোগ দেয়ার ফলে সাহেবের প্রচুর মুনাফা হতে লাগলো। ফলে আমার এবং ভাইদের কদর তাদের কাছ আরো বেড়ে গেল।

আসলে আমার দুভাই তাদের প্রতিভা ও সততা দিয়ে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের দায়িত্ব পালন করাতে অনেক অনিয়ম বন্ধ হয়ে যায়। ফলে স্বাভাবিক নিয়মেই মুনাফা বেড়ে যায়।

আমাদের তিন ভাইবোনের বেতনও আশাতীত বেড়ে যায়। এভাবে আমরা অভাবি থেকে সচ্ছল হয়ে উঠি। এ সবকিছুই মহৎ ইমাম চাচার অবদান। তিনি এখানে না আনলে আমি হয়তো বা অনাহারে অত্যাচারে মারা যেতাম।

সাহেবের নাম ধরা যাক লতিফ। বেগম সাহেবের অনুপস্থিতিতে সাহেবের ঘরে যাওয়ার অনুমতিও আমাকে বেগম সাহেব দিলেন। এখন আমি ভালোবাসার মানুষকে আরো কাছে পেলাম।

সাহেব দেখলাম খুব উন্নত চরিত্রের। কোনোদিন আমার দিকে চোখ তুলে তাকাতেন না। আমি নানা অঙ্গভঙ্গি করেও তাকে আকৃষ্ট করতে পারতাম না। আসলে আমার প্রেম ছিল একতরফা। আমি তাকে ভালোবাসতাম কিন্তু তিনি ভালোবাসতেন না।

একবার সাহেব, বেগম সাহেব ও তার বাবা মা আমেরিকা বেড়াতে যান। বাসার সব দায়িত্ব আমার এবং মিলের দায়িত্ব আমার ভাইদের ওপর দিয়ে যান। কিন্তু কিছুদিন না যেতেই মিলে অসন্তোষ দেখা দেয়াতে সাহেব একাই ফিরে আসেন।

এদিকে ফোনে বেগম সাহেব আমাকে বার বার মনে করিয়ে দেন তার অনুপস্থিতিতে যেন সাহেবের সেবা-যত্নের কোনো ত্রুটি না হয়।

সাহেব আসার পর আমার ভাইদের প্রচেষ্টায় তিন-চার দিনের মধ্যে মিলের গণ্ডগোল থেমে যায়। এ কয়দিন সাহেবের দিকে তাকানো যেতো না। অনেক রাতে এসে বিছানায় গা এলিয়ে দিতেন।

এক রাতে সাহেব এতটাই ক্লান্ত ছিলেন যে, এসে জুতাসহ ঘুমিয়ে পড়লেন। দেখে আমার চোখে পানি এসে গেল। আমি এসে জুতা, প্যান্ট, শার্ট খুলে দিয়ে পায়জামা পরিয়ে দিলাম।

দেখলাম তিনি ঘুমের ঘোরে যন্ত্রচালিতের মতো সব করে নিলেন। তারপর গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লেন। আমার খুব মায়া হলো। এক সময় তার লোমশ বুকে মাথা লুকিয়ে কাদতে লাগলাম।

কাদতে কাদতে কখন যে তার বুকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বলতে পারবো না। এক সময় ঘুম ভেঙে গেলে দেখলাম তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে আছেন।

আস্তে করে হাত পা সরিয়ে নিজকে বন্ধন মুক্ত করে আমার রুমে ফিরে গেলাম। প্রেমিকের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হতে পেরে নিজকে ধন্য মনে করলাম। এতো সুখ ইতিপূর্বে কখনো পাইনি। নিজেকে খুব হালকা মনে হলো।

সকালে *বেড-টি* দিতে গিয়ে দেখলাম সাহেব লজ্জায় মরে যাচ্ছেন, হয়তো এ ভেবে যে, রাতে তার জুতা কাপড় কে খুলে দিয়েছে। আমি মিটি মিটি হাসছিলাম। শেষে বললাম, সাহেব রাতে আমি আপনার জুতা কাপড় খুলে দিয়েছিলাম।

তিনি আরও লজ্জা পেলেন।

পরের রাতে তাকে বেশ হাসিখুশি মনে হলো, সেই আগের মতো। বুঝলাম মিলের সমস্যার সমাধান হয়েছে। খাওয়ার টেবিলে বললেন, আমি তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ। তোমার ভাইদের সহযোগিতায় আজ সমাধান হলো। তোমাদের বেতন আরো বাড়িয়ে দিলাম।

শুনে আমি আহ্লাদে আটখানা। মনে হলো সাহেবের জন্য তাহলে কিছু একটা করতে পেরেছি।

সাহেবের নিয়ম ছিল ঘুমানোর আগে এক গ্লাস দুধ খেতেন। আমি সব সময় দুধ নিয়ে আসতাম। বেগম সাহেব না থাকাতে এ সময় আমি তাকে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করতাম। যেমন সাইড টেবিলে দুধ রাখার সময় এমনভাবে তার মুখের কাছে ঝুকে পড়তাম যেন ব্লাউজের ফাক দিয়ে স্তন দেখা যায়। কিন্তু লক্ষ্য করতাম তিনি নির্লিপ্ত, আমার দিকে তাকাতেন না।

আসলেই তিনি ছিলেন উন্নত চরিত্রের। আমি সময় পেলেই তার কাছে ঘেষে নারীর বিশেষ অঙ্গ দেখাতে সচেষ্ট হতাম। এমন কি বিছানা ঠিক করার উছিলায় তার বিশেষ অঙ্গে স্পর্শ করেও তাকে আমার দিকে আকৃষ্ট করতে পারিনি। অথচ আমি বেগম সাহেবের চেয়ে সৌন্দর্যে কোনো অংশে কম ছিলাম না।

কিছুদিন পর বেগম সাহেব আমেরিকা থেকে এসে সমস্ত বিবরণ শুনে খুশি হলেন এবং আমার ওপর তার নির্ভরতা আরো বেড়ে গেল। আমি তার আরো বিশ্বস্ত হলাম। এভাবে আমি সহচর থেকে সখিতে পরিণত হলাম। তারপর থেকে তিনি আমার সঙ্গে বান্ধবীর মতো আচরণ করতেন। এভাবে আমি বাদি থেকে বান্ধবী হলাম।

বছর খানেক পর বেগম সাহেব একদিন বললেন, মীরা আমার খারাপ লাগছে। আমি গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডেকে আনলাম। ডাক্তার সব দেখে ক্লিনিকে নেয়ার পরামর্শ দিলেন।

ক্লিনিকে ভর্তি করা হলে বিভিন্ন পরীক্ষার পর ক্যান্সার ধরা পড়লো। প্রথমে এদেশে চিকিৎসা করা হলো কিন্তু কোনো লাভ হলো না।

থাইল্যান্ড নেয়ার ব্যবস্থা করা হলো। যাওয়ার সময় বেগম সাহেব অশ্রুসিক্ত চোখে আমার হাত ধরে বললেন, মীরা আমি আর ফিরবো না। আমার জন্য দোয়া করো। লতিফকে তোমার হাতে দিয়ে গেলাম, তাকে দেখে রেখো।

আমি সান্ত্বনা দেয়ার কোনো ভাষা পেলাম না। তখন বুঝতে পারিনি এটা ছিল তার অন্তিম যাত্রা।

কিছুদিন পর তিনি লাশ হয়ে ফিরলেন। সব চেয়ে বেশি দুঃখ পেলাম আমি ও সাহেব। আমরা শোকে মুহ্যমান হয়ে গেলাম। কারো মুখে কোনো ভাষা নেই। *অল্প শোকে কাতর আর অধিক শোকে পাথর*।

সাহেব এতো শোকাহত হলেন যে দুই-তিন মাসের আগে তিনি স্বাভাবিক হতে পারলেন না। আমি সবকিছু আগলে রাখতাম। আর মিলের সবকিছু আমার ভাইয়েরা আগলে রাখতো।

এভাবে ছয় মাস কেটে গেলো। আমি আমার ভালোবাসা দিয়ে সাহেবকে স্বাভাবিক করলাম। আমি তাকে সব সময় ছায়ার মতো অনুসরণ করতাম।

এভাবে ধীরে ধীরে তিনি আমার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে গেলেন এবং আমার প্রতি আকৃষ্ট হতে লাগলেন।

তিনি এক রাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে লাগলেন। চুমোয় চুমোয় আমার সমস্ত শরীর সিক্ত করে দিলেন। আদর পেয়ে আমিও লতার মতো একেবারে নেতিয়ে পড়লাম।

প্রথম স্বামীর কাছে আদর কি জিনিস তা আমার কাছে একেবারে অজানা ছিল। আমি পুলকিত হলাম। সুখের সাগরে ভেসে গেলাম। আমি সুখের সন্ধান পেয়ে গেলাম।

আর এক রাতে আমি আমার স্বপ্নের রাজপুত্রের লোমশ বুকে ঝাপিয়ে পড়লাম। তারপর চুমোয় চুমোয় তার সমস্ত শরীর ভিজিয়ে দিলাম। জড়াজড়ির এক পর্যায়ে আমি হেচকা টানে তার পায়জামা খুলে ফেললাম এবং সে একে একে আমার শাড়ি, ব্লাউজ, পেটিকোট ও ব্রা খুলে নিল। তারপর আমার ওপর উপগত হলো। স্বর্গসুখ অনুভব করলাম। আমার জন্ম সার্থক হলো।

আজ আমি তার দু'সন্তানের গর্বিত মা (বন্ধ্যা অপবাদে এক সময় আমার সাবেক স্বামী আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল) যদিও আমি লতিফকে এখনো সাহেব বলেই ডাকি।

একদিন সে আমায় বলে, তুমি আমাকে সাহেব বলে ডাক কেন?

আমি বললাম, তুমিতো আমার সাহেবই। অতীতে ছিলে এখনো আছো।

এ কথা বলেই তার ঠোটে একটা ম্যারাথন চুমু দিলাম।

এভাবে আমি বাদি থেকে বেগম হলাম।

এখন বুঝি আমার সাবেক স্বামী নপুংসক ছিল।

গুলশান থেকে

কোকো

– মোহাম্মদ কালা মিয়া

আমি একজন মধ্য বয়স্ক অবিবাহিত যুবক। মধ্য বয়স্ক বলছি এই কারণে যে বর্তমানে আমার বয়স তেত্রিশ বছর। দেখতে রাজপুত্র বা প্রথম দর্শনেই কারো হৃদয় জয় করতে পারবো এমন নই। খুবই শাদাসিধে একজন কালো রঙয়ের মানুষ। তাই বন্ধুরা অনেকেই কৌতুক করে বলে, আর একটু বেশি কালো হলে

এবং গায়ে, পায়ে ও পিঠে আরো বেশি পরিমাণ লোম থাকলে আমাকে চিড়িয়াখানায় স্থায়ীভাবে বসবাস করানোর বন্দোবস্ত করা যেতো।

এই নিয়ে অবশ্য দুঃখ নেই। বরং মানুষ হিসেবে পৃথিবীতে জন্মেছি এটাই আমার পরম পাওয়া। প্রেম বা ভালোবাসা অন্তরে নেই এ কথা বলবো না। তবে এখন পর্যন্ত কোনো বাংলাদেশি মেয়ে একটি বারের জন্যও বলেনি আমাকে তাদের ভালো লাগে?

কৈশোরে কোনো এক ষোড়শী যুবতীকে বলেছিলাম, তোমাকে প্রাণের চেয়েও ভালোবাসি। উত্তরে বলেছিল, আমি নাকি দেখতে মাগুর মাছের মতো। তাই সে আর যাই করুক না কেন, কোনো মাছের সঙ্গে প্রেম করতে পারবে না।

তারপর স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজ, কলেজ পেরিয়ে যখন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলাম তখন ভাবলাম, এইবার নিশ্চয়ই কেউ না কেউ কপালে জুটবে। আক্ষেপ করে আর বলতে হবে না, এই পোড়া কপালে একবারও প্রেম এলো না।

ফার্স্ট ইয়ার শেষ করে যখন সেকেন্ড ইয়ারে পা রাখলাম তখনই ভাবনায় এলো শ্রাবন্তীকে মনের লুকিয়ে রাখা কথাটা প্রকাশ করা যায়। সিদ্ধান্ত পাকা, বুকে সাহস নিয়ে একদিন ইউনিভার্সিটি হল চত্বরে নীরবে নিভৃতে যখন দুই জনে পাশাপাশি হাটছি তখনই আচমকা বলে ফেললাম, শ্রাবন্তী তোর ভালোবাসা পেলে হাতের মুঠোয় প্রাণ নেবো, দুরন্ত ষাড়ের চোখে বেধে দেবো লাল কাপড়।

অমনি শ্রাবন্তী উত্তরে বললো বানরের আবার শখ কতো?

সে দেখতে সুন্দরী, প্রতিভাময়ী। বানরের গলায় মুক্তোর মালা হতে যাবে কোন দুঃখে। কথাটি শুনে আমি সম্পূর্ণ বাক্যহারা। না হয় দেখতে স্মার্ট বা হ্যান্ডসাম নই কিন্তু মানুষ তো? ঠোটকাটা মানুষদের মতো মুখের উপর এইভাবে বলতে পারলো! মুখ লুকিয়ে হৃদয়ের কষ্ট হৃদয়ে নিয়ে ফিরে এলাম আবাসিক হলের ছোট রুমে। সিদ্ধান্ত নিলাম, না আর কোনো বঙ্গ ললনা নয় যাদের কাছে বাহ্যিক সৌন্দর্য মুখ্য বিষয়।

ইউনিভার্সিটি পর্ব শেষ করে পাড়ি জমালাম সুদূর ইংল্যান্ডে। প্রায় দুই বছর হলো এখানে এসেছি। এই রাজ্যে পদার্পণ করেই বুঝতে পারলাম ইংরেজি ভাষা শেখার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই কালবিলম্ব না করে ভর্তি হয়ে গেলাম একটি ছয় মাসের ল্যাংগুয়েজ কোর্সে। সহপাঠীরা সকলেই আমার মতো ভিনদেশি। কেউ জার্মান, কেউ জাপানিজ, কেউ কোরিয়ান, কেউ পোলিশ, কেউ ফ্রেঞ্চ, কেউ ইরানি। প্রথম যে মেয়েটির সঙ্গে পরিচিত হলাম তিনি জাপানিজ, নাম কোকো ফুজিমুরি। ভাঙা ভাঙা ইংরেজি বলে। মনোযোগ দিয়ে না শুনলে বোঝা মুশকিল আসলে কি বলতে চায় বা চাইছে।

সেপ্টেম্বরে কোর্স শুরু করেছিলাম। ডিসেম্বর মাসে চার সপ্তাহের জন্য কৃসমাস ভ্যাকেশন পেলাম। এই তিন মাসের মধ্যেই কোকো আমার বেস্ট ক্লাসমেট। এক সঙ্গে কফি খাই, সিনেমা দেখি, ডিসকোতে যাই, উইকএন্ড–এ বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ঘুরে দেখি। এইভাবে হাসি ও ঠাট্টার মধ্য দিয়ে দিনগুলো দারুণ কেটে যাচ্ছিল। মাঝে মধ্যে ইনডিয়ান খাবার, জাপানিজ খাবার সুশি, এসব খেতে যাই। আমার অবশ্য মনে হয়েছে, জাতি হিসেবে জাপানিজরা লাজুক, ভদ্র এবং অন্তর্মুখী প্রকৃতির। আমার ধারণা ভুলও হতে পারে। কারণ আমি তো দেখেছি এবং মিশেছি একজনের সঙ্গে।

একদিন কোকো বললো থিয়েটারে যাবে নাটক দেখতে।

লন্ডনে থিয়েটারের টিকেট একজন ছাত্রের কাছে বেশ ব্যয় সাপেক্ষ। অন্যদিকে আমার একটু আর্থিক দৈন্যদশা চলছিল। তাই বললাম, আজ না অন্য আর একদিন।

হঠাৎ বিকেলে কোকো ফোন করে বললো, ঠিক সন্ধ্যা ছয়টায় তার সঙ্গে কভেন্ট গার্ডেন আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশনে দেখা করি, কি যেন একটা জরুরি বিষয় নিয়ে আলাপ করতে চায়।

সন্ধ্যায় ঠিক সময়ে যখন স্টেশনে পৌছালাম, দেখলাম কোকো–এর হাতে থিয়েটারে ঢোকার জন্য দুটো টিকেট। নাটক দেখা শেষ করে যখন থিয়েটার থেকে বেরিয়ে এলাম কোকো বললো, তার ভীষণ হাটতে ইচ্ছে করছে। তাই দুই জনেই স্থির করলাম টেমস নদীর তীর ঘেষে পাবলিক পাথ দিয়ে হাটবো। হাটতে

হাটতে যখন দুই জনই ক্লান্ত তখন নদীর পাড়ে একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসলাম। রাত দশটা। তখনো জানি না, আমার জন্য একটা বিরাট সারপ্রাইজ অপেক্ষা করছে। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যখন আলাপ করছি ঠিক সেই মুহূর্তে কোকো আমার একটি হাত তার হাতের মুঠোয় নিয়ে বললো, কালা মিয়া, আই অ্যাম ইন লাভ উইথ ইউ।

তখন আমার মনের অবস্থা হলো পারলে টেমস নদী সাতরিয়ে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চলে যাই। ভালোবাসার নিদর্শন স্বরূপ কোকো-কে তৎক্ষণাৎ এক বাক্স চকলেট, একশ বাংলাদেশি টাকা এবং বাংলাদেশের একটি মানচিত্র উপহার দিলাম। মানুষ হিসেবে আমি অতি আবেগি। তাই কেউ যদি আমাকে বিনয়ের সঙ্গে কিছু বলে ইচ্ছে করে তাকে ভ্যান গঘ-এর মতো কান কেটে উপহার দিতে। কারণ কলিজা কেটে উপহার দিতে গেলে নিজেই মরে যাবো।

মনে মনে বললাম, এতো সুখ সইবে তো কপালে। মনে পড়ে গেল পুরনো অতীতের ভালোবাসার মানুষদের কাছে পাওয়া লাঞ্ছনা এবং বঞ্চনার কথা। সুখের দিনগুলো ক্ষণস্থায়ী। মার্চ মাসে আমাদের কোর্সটা শেষ হয়ে গেলো। যেহেতু একমাত্র মেয়ে তাই কোকো-কে ফিরে যেতে হবে জাপানে বাবার ব্যবসা দেখাশোনার জন্য। কোকো চলে যাচ্ছে এই জন্য আমার ভীষণ মন খারাপ। এয়ারপোর্টে সি অফ করতে গেলে কোকো বললো তার বাবাকে বুঝিয়ে আগামী সেপ্টেম্বরে এমবিএ কোর্স করতে লন্ডনে আসবে, সেটা নাকি যতোটা না জরুরি তারচেয়ে আমাকে মিস করবে এই জন্য আবার ফিরে আসা।

আমিও আশ্বস্ত হলাম এই ভেবে যে, মাত্র ছয় মাসের বিরহ তারপর তো আবার দেখা হচ্ছে। জাপানিজ এয়ারলাইন্সে করে সে চলে গেল তার আবাসস্থল নাগাসাকি শহরে যেখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন বাহিনী এটম বোমা নিক্ষেপ করে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল। গিয়েই মেইল করলো ভালোভাবে পৌছেছে এবং সবকিছু ঠিকঠাক মতো চলছে। এমনি করে তিন মাস আমাদের মধ্যে নিয়মিত মেইল এবং টেলিফোন বার্তা বিনিময় হলো। নিজের অজান্তেই মাঝে মধ্যে মনে হতো হায়রে প্রেম, তোমার পবিত্র শিখা চিরকাল জ্বলে, লন্ডন হতে আসে প্রেম নাগাসাকিতে যায় চলে। সম্পর্কের স্তর গভীর থেকে আরও গভীর হলো। দুজনেই সিদ্ধান্ত নিলাম কোকো লন্ডনে এলেই আমরা বিয়ে করবো। শুরু করবো জীবনের নতুন অধ্যায়। স্বপ্ন দেখা শুরু করলাম। স্বপ্নে দেখি নীড়ের পাখি আসছে নীড়ে, অনেক পাহাড় মাঠ পেরিয়ে ভালোবাসা ঠোটে করে, পাখি আমার নীড়ের পাখি। স্বপ্নগুলো খুব ভীতু হয় তবুও আমি স্বপ্নে দেখি। সারাক্ষণ একটাই চিন্তা, একটাই ভাবনা, কখন আসবে সেই ক্ষণ যখন কোকো-কে জড়িয়ে ধরে বলবো, লক্ষ্মী মেয়ে এতোদিন কেন আসোনি ইত্যাদি আরো অনেক কথা। আমার দিন ফুরোয় তো রাত ফুরোয় না, আবার রাত ফুরোয় তো দিন ফুরোয় না এই অবস্থা। কিন্তু চির সত্য এই যে, স্বপ্ন খুব কমই বাস্তবে রূপান্তরিত হয়।

বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎ করেই কোকো মেইল পাঠানো বন্ধ করে দিল। ভাবলাম, আমি বোধ হয় তাকে একটু বেশি মাত্রায় বিরক্ত করছি, তাই আমার জন্য এমন শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। নয়তো বাবার ব্যবসা দেখাশোনা করা নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। অথবা নতুন কোনো জাপানিজ ছেলে বন্ধু জুটে গেছে তাই এই বাঙালি মানুষটাকে আর মনে রাখার দরকার নেই। এক সপ্তাহ, দুই সপ্তাহ, তিন সপ্তাহ, চার সপ্তাহ অপেক্ষা করে আমিও মেইল পাঠানো বন্ধ করে দিলাম অনেকটা অভিমান করে।

শেষ ধৈর্যের বাধ রাখতে না পেরে কোনো এক রবিবার ফোন করলাম তার বাসায়। কোনো উত্তর নেই অপর প্রান্ত থেকে। ধীরে ধীরে হতাশা আমাকে গ্রাস করতে শুরু করেছে। অনেকদিন চেষ্টার পর অবশেষে একদিন অপর প্রান্ত থেকে কেউ একজন ফোন রিসিভ করলো। পুরুষ কন্ঠ, ফোন তুলেই বললো খনি চিভা, মানে জাপানিজ ভাষায় যাকে বলে হ্যালো।

আমি ইংরেজিতে বললাম, লন্ডন থেকে কালা মিয়া বলছি, কোকো-এর সঙ্গে কথা বলতে পারি কি?

হঠাৎ কবরের নিস্তব্ধতা, তারপর কান্নার আওয়াজ এবং তিনি যে কথাটি ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বললেন তার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। গত একুশ দিন আগে ওসাকায় অবস্থিত বৃটিশ কনসুলেটে অফিস

থেকে ভিসা নিয়ে বাড়িতে ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছে আমার প্রিয়তমা কোকো। আজই ওর ফিউনেরাল সেরেমনি সম্পন্ন হলো, তাই তার বাবা এসেছে ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দিতে এবং তার সমস্ত মালপত্র বাবার বাড়িতে নিয়ে যেতে।

টেলিফোনটা রেখে দিয়ে উদভ্রান্তের মতো চিৎকার দিয়ে কান্নাকাটি শুরু করলাম। মনের মধ্যে ব্যাপক তোলপাড় শুরু হলো বুঝতে পারলাম, কোথায় যেন একটা বিশাল শূন্যতা অনুভব করছি। কোকো স্বর্গবাসী হয়েছে আজ নয় মাস হলো। কোকো-কে স্মরণ করে মাঝে মধ্যে ব্যাটারসি পার্কে অবস্থিত বৌদ্ধ মন্দিরে গিয়ে মোমবাতি জ্বালিয়ে দিই আর মনে মনে বলি প্রিয়তমা আমার শান্তিতে ঘুমাও আর ভালো থেকো। অপেক্ষা করো, আমিও একদিন স্বর্গে গিয়ে তোমার সঙ্গে মিলিত হবো।

ইদানীং প্রায়ই মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায়। বুকের মধ্যে কষ্টটা ঢোলের বাদ্য বাজায়। তখনই দূর থেকে সিডি প্লেয়ারে ভেসে আসে তপন চৌধুরীর গাওয়া একটি গান, পাথর কালো রাত, তারার বাগান শূন্যে। পৃথিবীটা ঘুমালেও জেগে থাকে যদি কেউ, সে আমি, কোকো শুধু তোমার জন্য।

লন্ডন থেকে
smh973@hotmail.com

জেএমবি থেকে মানুষ

- সুমি

১৭ আগস্ট রাত আটটা বাজে।

সোহেল ভাই এসে বললো, আমাকে বাচাও, পুলিশ পিছু নিয়েছে।

কেন তারা আপনাকে তাড়া করছে?

পরে সব খুলে বলবো। পুলিশ এলে কিছু বলো না। এখনি পুলিশ এসে পড়বে, আমি লুকাচ্ছি।

বাসায় কেউ আছেন? আমরা পুলিশের লোক।

দরজা খুলে বাইরে এলাম। এদিকে একজন কৃমিনাল পালিয়েছে, আপনি কি তাকে দেখেছেন?

না, আমি দেখিনি।

ঠিক আছে। আপনাকে কষ্ট দিলাম। চলি।

সোহেল ভাই, পুলিশ কেন আপনার পিছু নিয়েছে?

বলতে পারবো না।

বলতে আপনাকে হবেই।

এতো করে যখন বলছো তাহলে শোনো। আমি জেএমবি সদস্য। আজ সকালের বোমা হামলার সঙ্গে আমি জড়িত। নেত্রকোনা আদালত ভবনে বোমা মেরেছি।

একি সাংঘাতিক কথা। এমন বিপথগামী আপনি কবে হলেন?

সুমি, আমার এ পরিণতির জন্য তুমিই দায়ী। সেই কবে থেকে তোমাকে ভালোবেসেছি। সেদিন যখন ভালোবাসার কথা জানালাম, তুমি কি অপমানটাই না করলে। তোমার ব্যবহারে আমি মানসিকভাবে ভেঙে পড়ি। তোমাকে ভুলে থাকার জন্য নেশা করতে শুরু করলাম। নিষিদ্ধ স্থানে আমার যাতায়াত বেড়ে গেল। এভাবে সমাজের নানা ধরনের মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। এর ধারাবাহিকতায় পরিচয় হয় শিমুল নামের এক জেএমবি সদস্যের সঙ্গে। আমার বিষণ্ণতা দেখে সে বুঝতে পারে, আমার এ নেশার পেছনে কিছু একটা লুকিয়ে আছে। তাকে সব কিছু খুলে বলি। সে সব শুনে আমাকে ব্যবহার করলো। আমাকে বোঝালো। একটি সাধারণ মেয়ের জন্য জীবনটাকে কেন ধ্বংস করছো। আল্লাহর দেয়া জান-প্রাণ তার রাস্তায় উৎসর্গ করো।

আমি না করতে পারলাম না। পা বাড়ালাম নিষিদ্ধ পথে। কিন্তু আজ বুঝতে পারছি, সেদিন কি ভুলটাই না করেছিলাম। সেদিন যদি আমার ভালোবাসাকে ফিরিয়ে না দিতে তাহলে হয়তো এ পথে পা দিতাম না।

চুপ করুন সোহেল ভাই, চুপ করুন।

সুমি, আজ আমাকে ভালোবাসো আর নাই বাসো এতে আমার কিছু আসে যায় না। তবে আমি এ পাপের পথ থেকে ফিরে আসবো। আমার ভুল বুঝতে পেরেছি।

সত্যি বলছেন সোহেল ভাই?

হ্যা সত্যি। আমি আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে চাই।

সোহেল ভাই আজ আর আপনাকে ফেরাবো না। আপনাকে ভালোবাসি। আজ এ মুহূর্তে আমার চেয়ে সুখী আর কে আছে বলুন? আমার ভালোবাসা দিয়ে অন্তত একজন জেএমবি সদস্যকে সুপথে ফেরাতে পেরেছি। আমার আজ চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে, তোমরা দেখে যাও, ভালোবাসা দিয়ে একজনকে মানুষ বানাতে পেরেছি।

তাই মেয়েদের বলছি, আমার মতো ভুল করবেন না। কাঙ্ক্ষিত মানুষটিকে ভালোবাসা দিন। তাকে দেশবিরোধী কাজ থেকে ফিরিয়ে আনুন।

নেত্রকোনা থেকে

দখিনা দুয়ার

– হোসেনুজ্জামান চৌধুরী

দয়া করে কেউ ভালোবাসায় পড়বেন না। যদিও ইদানীং টিনএজদের ভালো লাগা ও ভালোবাসার মধ্যে পার্থক্য সামান্যই। ভালোবাসা মানে দখিনা দুয়ার, তিন বেড, তিন বাথ রুম না হলেও পার্ক ও চায়নিজ রেস্টুরেন্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ একটু হাত ধরাধরি, দুই ঘণ্টা ডেটিং এবং এক হাজার টাকা = এক দিনের ভালোবাসা। অবশ্য এর যে ব্যতিক্রম নেই তা নয়। টিনএজদের ভালোবাসা নিয়ে কটাক্ষ করাও আমার এ লেখার উদ্দেশ্য নয়, আমি তা করতে চাইও না। একটি ব্যাপারে নিঃসন্দেহ যে, ভালোবাসা মানসিকতার ব্যাপার। মা-বোনকে ভালোবাসা আর প্রেমিক প্রেমিকাকে ভালোবাসা নিশ্চয়ই এক নয়। অর্থাৎ পরিবেশ, পরিস্থিতি ও মানুষ ভেদে ভালোবাসার ধারা ভিন্ন। এ ক্ষেত্রে ইংরেজি ীমশণ ও ীধপণ শব্দ দুটো দ্বারা ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়। কোনো ছেলে যদি তার ঐধরফ এরধণভঢ-কে অথবা কোনো মেয়ে যদি তার ঈমহ এরধণভঢ-কে বলে অ ফধপণ হমল তবে যে কেউ যেন ীধপণ-কে ভালোবাসা না বোঝেন। এতে পরে সমস্যা হলেও হতে পারে। *ভালোবাসা ও ভালো লাগা এক নয়* গানটি তো আর শুধুই গাওয়া হয়নি। ীমশণ ও ীধপণ-এর আরেকটি বড় পার্থক্য-সম্ভবত ীমশণ শব্দটির সঙ্গে প্রচুর আবেগ জড়িত, ীধপণ-এ তা নেই।

যাই বলা হোক না কেন, অনিবার্যভাবে ভালোবাসা ঘৃণার বিপরীত। ঘৃণা যদি হয় অসুন্দর, ধ্বংস তবে অবশ্যই ভালোবাসা অর্থ সুন্দর, সৃষ্টি। তা ীমশণ হোক আর ীধপণ হোক, টিনএজদের ভালোবাসা হোক আর লাইলি-মজনুর ভালোবাসা হোক, দুঃখজনক হলেও সত্য বর্তমান সমাজে ভালোবাসা, সম্প্রীতির বড় অভাব, বিশেষ করে শহুরে জীবনে। সবাই কথা বলেন মেপে, হাসেন মেপে ও ভালোবাসা কিংবা সৌহার্দ দেখানও মেপে।

১৪ ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবসে প্রার্থনা একটাই, আমরা একে অপরকে Love না করলেও অন্তত যেন Like করি। এতে আমাদের পৃথিবীটা অনেক সুন্দর হবে।

আনোয়ারা, চট্টগ্রাম থেকে

ছায়াবীথি

জীবনে যখন প্রথম ভালোবাসা এলো তখন আমার বয়স পনেরো। সবে এসএসসি দিয়েছি। সবার কাছে সুন্দরী বলেই পরিচিত ছিলাম। আমার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা সবটাই গ্রামে। বিখ্যাত বংশের সম্ভ্রান্ত পরিবারে আমার জন্ম। বোনদের সবার ছোটবেলায় বিয়ে হয়ে গেলেও আমি কলেজ পর্যন্ত গিয়েছি। অবশ্য এর বহু আগে থেকেই বিয়ের তোড়জোর চলছিল।

এরই মধ্যে পাশের বাড়ির এক ভাই একদিন একটা বইয়ের ভেতরে করে চিরকুটে ভালোবাসার প্রস্তাব দিল। এই চিরকুট আমার মধ্যে অন্য রকম এক অনুভূতির জন্ম দিল। সে এবং আমি এক বংশের হলেও পাত্র হিসেবে সে ছিল আমার অযোগ্য। কারণ সেও ওই বছরই এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছিল এবং সেটা ছিল চতুর্থবার।

তাই বুঝে গেলাম আমার পরিবার কোনোদিনও তাকে মেনে নেবে না আর সে জন্যই আমার ভালো লাগার অনুভূতিটাকে বাইরে প্রকাশ করলাম না। এমনকি তার কাছেও না।

আমি চেপে রাখলেও সে পারলো না। চারদিকে ফিশফাশ শুরু হয়ে গেল। শুধু দূর থেকেই দুজন দুজনকে দেখতাম। কোনোদিন একদণ্ড কথা বলার সুযোগ কিংবা সাহস হয়নি।

এরই মধ্যে দুজন কলেজে ভর্তি হলাম। আমি লেখাপড়া চালিয়ে গেলেও সে ওই ভর্তি পর্যন্তই।

আমার অন্য বোনেরা শহরে থাকে এবং তাদের স্বামীরাও ভালো অবস্থানে আছে আর এদিকে তার এই যোগ্যতা!

বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান হওয়ায় তারা চেষ্টা করলেন ছেলের ভালোবাসাকে পূর্ণতা দিতে। কিন্তু আমার পরিবার এই অযোগ্য ছেলের কাছে মেয়ে দেবে না বলে সাফ জানিয়ে দিল।

দুঃখ, অপমানে তার বাবা তাকে অন্য জায়গায় বিয়ে করালেন। সমাপ্তি ঘটলো আমার প্রথম ভালোবাসার।

এর কয়েক মাস পর আমার বিয়ে হলো আমার চেয়ে সতেরো আঠারো বছরের বড় ইউনিভার্সিটির সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী এক পাত্রের সঙ্গে। বয়সের ব্যবধানটা কখনো মনেই আনিনি।

স্বামীকে প্রচণ্ড রকম ভালোবাসলাম। ইন্টারমিডিয়েট পাস করলাম। দুই বছরের মাথায় আমার প্রথম সন্তান এলো। তার দুই মাস বয়সে অনেক স্বপ্ন নিয়ে স্বামীর কর্মস্থলে গেলাম সংসার সাজাতে। কিন্তু বিধি বাম।

হঠাৎ করেই তার মন-মানসিকতায় পরিবর্তন এলো। সে আলাদা রুমে থাকতে শুরু করলো। তার নাকি এক সঙ্গে থাকতে ভালো লাগে না। বহু অনুরোধ করেছি, বুঝিয়েছি স্বাভাবিক হওয়ার জন্য।

কিন্তু তার এক কথা, পরিবর্তন হবে না।

প্রতিবাদ করলে ঘর ভাঙার হুমকি দিতো।

আঠারো উনিশ বছরের উজ্জ্বল, উচ্ছল, সুন্দরী যুবতী বুঝে গেল তার ভবিষ্যৎ।

বাইরে কাউকে কিছু বুঝতে দিতাম না। ঘরে বাইরে কাধে কাধ মিলিয়ে চলেছি। আত্মীয়-স্বজনকেও কিছু জানাইনি জোর করে ভালোবাসা চাইনি বলে। অসীম ধৈর্য নিয়ে দিন কাটাতে লাগলাম। বিএ পাস করলাম।

সে চায়নি বলে কোনো পেশায়ও জড়ানো হলো না। কোনোদিন বুয়া, মুচি, মাস্টার, দর্জি, নাপিত কাউকেই এক পয়সা দিইনি। জুতা সেলাই থেকে চণ্ডি পাঠ একাই সামলাতাম। সেই সঙ্গে পাকা রাধুনিও। পার করে দিলাম আট বছর।

তবে হ্যা, শরীরী সম্পর্কটা একেবারেই ঘটতো না তা নয়। কিন্তু সেটা জোর করে কালেভদ্রে।

সে অনেকবার বলেছে, শরীরের চাহিদা যেন আমার না থাকে। এ জন্য ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে বলেছে। যাইনি, ধৈর্য দিয়ে সব সামলে নিয়েছি।

একদিন তার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু এসব জানার পর হাত ধরে বললো, প্রয়োজন মনে করলে বলবেন, সাহায্য করবো।

এই প্রথম স্বামী ছাড়া কোনো পুরুষ আমাকে স্পর্শ করলো। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঘর থেকে বের করে দিলাম।

এরপর থেকে তার আসা যাওয়া বাড়তে লাগলো। সাহায্যের কথা ভেবে তাকে বন্ধু ভাবতে লাগলাম।

কিন্তু তার চোখে ছিল অন্য চাওয়া। ধীরে ধীরে তার কথা–বার্তা, আবেগ–অনুভূতি আমাদের একটা সম্পর্কে নিয়ে গেল।

শুরু হলো আমার তৃতীয় ভালোবাসা।

জানতাম এটা অন্যায়। তবু স্বামীর ওপর রাগ করেই এ পথে পা বাড়ালাম। পরিবেশ পরিস্থিতি এবং স্বামীর আচরণই আমাকে ভ্রান্ত পথের দিকে ঠেলে দিল।

তার আধিপত্য দিন দিন বাড়তে লাগলো। ছোয়াছুয়ি শুরু হলো। কিন্তু চূড়ান্ত পর্বে কখনো যেতে দিতাম না।

সে কথা দিয়েছিল জোর করে কিছু করবে না তবু অভিযোগ অনুযোগের শেষ ছিল না। বলতো, সম্পদের ভাণ্ডার নষ্ট করে ফেলছি তবু কেন যেতে দিই না।

খুব ধৈর্য নিয়ে চূড়ান্ত পর্বের কাছাকাছি গিয়েও ফিরে এসেছি, কিছুতেই রাজি হইনি।

দেড় বছর পার করলাম।

একদিন তার ভালোবাসার স্পর্শে আপ্লুত হয়ে বাধা দেয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেললাম।

ঘটে গেল প্রলয়।

তবে তা সম্পূর্ণ ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে।

দুই পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় তার হাড়ির সব খবরই আমার জানা ছিল। স্ত্রীর সঙ্গে তার দৈহিক মিলন চলতো দুই তিন ঘণ্টা পর্যন্ত। অথচ এখানে সে দুই তিন সেকেন্ডও নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পারলো না। তবে ঘরে তার স্ত্রীর ভূমিকা থাকতো শুধুই পড়ে থাকা। কোনো রকম সহযোগিতা স্ত্রীর কাছ থেকে পায়নি এবং তার ভোগটা চলতো একপাক্ষিক।

আগেই কথা হয়েছিল কেউ কারো সংসারের ক্ষতির কারণ হবো না, যার যার অবস্থান থেকে যতোটুকু সম্ভব।

সে ছিল দুই সন্তানের জনক আর আমি একজনের মা। বহু চিকিৎসা তদবির করে যে লাভ হলো তাতে কখনো সে দুই তিন মিনিট পর্যন্ত পৌছাতে পারতো।

এই ব্যর্থতার দরুন তার অনুশোচনার সীমা ছিল না। মাঝে মধ্যে বলতো, অযথাই তোমাকে নষ্ট করলাম, কোনো সুখ দিতে পারলাম না। তোমার সামনে আসতেই লজ্জা হয়।

আমার কিন্তু তার ব্যর্থতায় কোনো দুঃখ ছিল না। কারণ আমি ছিলাম ভালোবাসার কাঙাল এবং আমাকে ভালোবাসায় কানায় কানায় পূর্ণ করে দিয়েছিল। শরীরী সুখের চেয়ে ভালোবাসাকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছি।

এমনি করে কেটে গেল দশ বছর। এরই মধ্যে তার একটা সন্তানের মা হলাম। আমাদের ভালোবাসার এই ফসলের সে একটা সুন্দর নাম দিল।

তার বড় ছেলে চাকরি করে আর ছোট ছেলে পড়ালেখা করে। আমার পিচ্চিটা চার বছরের।

রাতারাতি সে অনেক টাকার মালিক হলো। তার আর্থিক অবস্থা বদলে গেল।

সেই সঙ্গে বদলে গেল আমার সেই চেনা মানুষটাও। যে মানুষটা আমার পরিবারের পরম বন্ধু ছিল সে আমাদের এড়িয়ে চলতে লাগলো। কথা বলে না। যে আমাকে না দেখতে পেলে ঘণ্টা মিনিট হিসাব করতো সেই আমার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াতে লাগলো। তাকে একটু কাছে চাওয়া বা একটা চুমু দিতে চাওয়ার অপরাধে লাথি থেকে গলা ধাক্কা সব পেয়েছি।

সে আমার নাম দিয়েছিল বীথি।

আমি ছায়াবীথি হয়ে তাকে ছায়া দিয়েছি এতোটা বছর আর সে আমাকে সমূলে উৎপাটন করেছে দেড় বছর চেষ্টার পর। আমাকে নষ্ট করেছে। ব্যর্থভাবে দশটা বছর কাটিয়ে অবশেষে নষ্টা বলতেও ছাড়েনি। শুধু নষ্টা নয়, একেবারে বাজারের নষ্টাও বলেছে।

তার সন্তানদের কেউ অসুস্থ হলে তাকে পাগল হতে দেখেছি। অথচ আমার এই বাচ্চাটি এক মাস অসুস্থ থাকার পরও একবার জিজ্ঞাসা করেনি তার খবর। এই বাচ্চাটার সঙ্গেও কথা বলে না।

এসব মানসিক অত্যাচারের কারণে পাকাপাকিভাবে হাই প্রেশারের রোগী হয়ে গেলাম। প্রেশার বাড়ার কারণে দিনের পর দিন অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকতাম। হাতজোড় করে তাকে বলেছি, এমনি অসুস্থ থাকলে মরে যাবো, আমার বাচ্চাগুলো মা হারা হবে। আমাকে মেরে ফেলো না।

সে বলেছে, মরলে আমি কি করবো?

যে স্ত্রী সুখ দেয় না বলে আমার সঙ্গে সম্পর্ক গড়েছিল, এখন সেই স্ত্রী ছাড়া কিছুই বোঝে না। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে একাধিকবার দেশের বাইরে ঘুরে এসেছে। জানতেও পারিনি।

কতো আর সহ্য করা যায়? আজ ছয় মাস হয় তাকে ছেড়ে এসেছি। স্বামীর কাছে বা তার কাছে আমার কোনো চাওয়া পাওয়া ছিল না, এমন কি ঈদ পার্বণেও না। স্বামী, সন্তান, সংসার, সন্তানের ভবিষ্যৎ, নিজের ভবিষ্যৎ সব কিছুর ঊর্ধে তাকে স্থান দিয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত এই হলো আমার পুরস্কার।

নাম বিহীন, ময়মনসিংহ থেকে

স্বপ্ন পুরুষ

– স্বর্না চৌধুরী

জীবনে প্রথম একটি বেসরকারি ফার্মে চাকরি পাওয়ার সুবাদে কর্মস্থলে জয়েন করার উদ্দেশ্যে রওনা হই। অবশ্য যে জায়গায় আমার চাকরি হয় সে জায়গা সম্পর্কে লোকমুখে অনেক আজেবাজে মন্তব্য শুনেছি। চাকরিতে গিয়ে দেখি সত্যি ভয়ংকর। তবে আমাদের কোনো সমস্যা হয়নি। আমরা বাইরের লোক বলে কোনো কিছু নিয়ে মাথা ঘামায়নি। কেউ কোনো মন্তব্য করলেও সহ্য করেছি।

দেখেছি চোখের সামনে আত্মহননকারীর লাশ। হত্যা করা মানুষের লাশ।

সে যাই হোক।

এই ভয়ংকর জায়গায় জীবনের ছন্দপতন ঘটে যাবে তা ভাবতে অবাক লাগে। অফিসে ঢুকতেই পাশের রুম থেকে একজনের খুব চিৎকার, এই কে? কে?

আমার সঙ্গে আমার বড়ভাইও ছিলেন। অন্য রুমে একজন টেবিলের ওপর একগাদা কাগজপত্রের স্তূপ রেখে কি যেন লেখালেখি করছেন। তার কাছে জানতে চাইলাম অফিসের প্রধান কোন রুমে বসেন এবং কে। তার কাছে গেলাম এবং জয়েনিং লেটারটা দিলাম। কিছুক্ষণ তার সঙ্গে কথাবার্তা বললাম। তারপর ঘুরেফিরে অফিসটা দেখতে লাগলাম এবং চিৎকার করা লোকটির কাছে যেতেই যত্নের সঙ্গে বললেন, বসেন।

বসলাম তার সামনের চেয়ারে। জানতে চাইলেন কি নাম? বাড়ি কোথায়? এবং কোন পোস্টে।

আমিও জানতে চাইলাম কোন পোস্টে। বললেন অ্যাকাউনট্যান্ট। এরপর কেয়ারটেকারের সঙ্গে গেস্ট রুমে পাঠিয়ে দিলেন।

প্রথম দিন এভাবে কাটলো। রাতে বিছানায় গিয়ে ভাবলাম, অফিসে ঢুকতেই যে ধমক খেলাম জানি না চাকরি করা হয় কি না। বলে রাখা ভালো, চাকরির শুরুতে তেমন সুন্দরী ছিলাম না। কিছুদিন পর শরীরের যথেষ্ট পরিবর্তন এলো এবং কয়েকজন ব্যাচেলর কলিগও আমার প্রতি দুর্বল হতে লাগলেন। সবাইকে বাদ দিয়ে ওই ধমককারীকে আমার ভালো লাগতো। তবে সেটা কখনো তাকে বুঝতে দিইনি। তার লেখার

ভঙ্গিটা খুব ভালো লাগতো। অ্যাকাউনট্যান্ট যখন আলতোভাবে কলমটাকে ঘুরিয়ে লিখতেন তখন আমার হৃদয় ছুয়ে যেতো।

একদিন তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনিও চোখ তুললেন আমার দিকে। খুব লজ্জা পেলাম। এরই মাঝে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হলাম। তিনিও আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে গেলেন। আমাকে বিভিন্ন রকম গাইড দিতে লাগলেন। অবশ্য অফিস শেষে বিকেলে অফিসের ছাদে বসে গল্প-গুজব করা হতো। প্রথম দিকে আমার বাসা ভাড়া করা নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হওয়ায় বার বার সিদ্ধান্ত নিলাম চাকরি ছেড়ে দেবো। অফিসের দুই বসের নানা রকম মন্তব্য আমার বাসা ভাড়ায় জটিলতা সৃষ্টি করে।

অফিস থেকে বৃক্ষরোপণ মেলায় অংশগ্রহণ করা হয়েছিল। মেলা চলাকালীন একদিন অফিসে অ্যাকাউনট্যান্ট আমার কাছে দুই টাকা চাইলেন। অনেক জোরাজুরি করলেন দুই টাকা নেয়ার জন্য। আমি নাছোড়বান্দা, টাকা দিলাম না। বললেন, আমার কাছে একটি টাকাও নেই। দুইটা টাকা দেন। এক কাপ চা খাবো।

বিকেলে অফিস শেষে অফিসের আলমিরার চাবি আমার কাছে থাকায় মেলায় গেলাম তাকে চাবি দেয়ার জন্য। মেলায় অনেক ডাকাডাকি করার পরও তিনি কোনো কথা বললেন না। তাই চাবি নিয়েই বাসায় চলে যাই। রাতে শুয়ে অনেক কাদলাম। ভাবলাম এই পৃথিবীর কেউ বুঝি আপন হয় না। পরদিন অফিসে গিয়ে তাকে ডাকলাম। উত্তর দিলেন না। এভাবে প্রায় পনের দিনের মতো আমার সঙ্গে কথা বললেন না।

কিছুদিন পর দুজন এতোটাই কাছাকাছি এলাম যে প্রতিদিন অফিস শেষে সন্ধ্যায় তিনি আমার বাসায় আসতে লাগলেন। আমার তখনো বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। এভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর তিনি প্রথমে আমার গলায় কিস দিতে চাইলেন। বাধা দিলেও পরে সায় দিয়েছি। তারপর ঠোটে কিস দিতে চাইলেন, দিলেন। তারপর বললেন, আমার শরীরের ওপরের অংশ দিলে হবে, নিচের অংশ না দিলেও হবে। বললেন, ওই পবিত্র জিনিসটা বিয়ের পর ব্যবহার করবেন।

এসব বলার পরদিন সন্ধ্যায় এলেন এবং আমার ব্রেস্টে কিস দিলেন। আমার উচু মাংসপিণ্ড দুটো কিস দিয়ে রক্তাক্ত করে তুললেন আর আমার নিচ দিয়ে বঙ্গোপসাগরের স্রোত বয়ে চললো। পরে জানলাম তিনি নাকি রাত দুটোয় গোসল সেরে তারপর ঘুমোতে গিয়েছিলেন।

এভাবে অনেকদিন চলতে থাকলো। আমার বোনের বাড়িতে প্রস্তাব পাঠালেন আমাকে বিয়ে করবেন বলে। বিপত্তি এলো দুজনের বাড়ির ব্যবধান বেশি বলে। আমার পক্ষ থেকে তার বাড়িঘর দেখতে যাবে বলে দিন তারিখ ঠিক হলো। কিন্তু কেউ যায়নি। অফিস ছুটি নিয়ে তিনি বাড়ি গেলেন। ধরে নিলেন বিয়ে হচ্ছে না।

তারপরও সব বাধা ডিঙিয়ে আমাদের বিয়ে হলো। এখনো ভাবি, এই কে? কে? ধমক দেয়া লোকটি কি হবে আমার শয্যাসঙ্গী। আজ আমরা দুজন থেকে তিনজন।

আমার স্বামী সত্যি ভালো মানুষ। জীবনে এমন একজন স্বপ্নপুরুষকে চেয়েছিলাম। সৃষ্টিকর্তাকে হাজারো সালাম। আমরা যেন সুখী হতে পারি। বিয়ের প্রথম ভালোবাসা দিবসে তাকে দিয়েছিলাম একটি শেভিং ফোম। আজও সেই ধমক খাওয়ার দিনটি মনে করে দুজন খুব হাসাহাসি করি।

সেওতা, মানিকগঞ্জ থেকে

বুবস ম্যান

– হোসেন তৌহিদ জুয়েল

আমি যখন ক্লাস সেভেনে পড়তাম তখন নাজনীন ম্যাডামের ইংরেজি ক্লাসে পড়া না পারার বা হোমওয়ার্ক না করার শাস্তি ছিল কান ধরে বেঞ্চের ওপর দাড়িয়ে থাকা। একদিন থার্ড বেঞ্চের কর্নারে যখন কান ধরে দাড়িয়ে রইলাম তখন হঠাৎ চোখ গিয়ে পড়লো আমার ঠিক সাইড বরাবর চেয়ারে বসে থাকা নাজনীন

ম্যাডামের বুকের ওপর। ব্লাউজ ভেদ করে তার শরীরের অতিশয় সেনসিটিভ অংশের কিছুটা বেরিয়ে আসার দৃশ্যটি আমাকে এতোটাই অভিভূত করলো যে প্রতিদিন কান ধরে বেঞ্চের ওপর দাড়িয়ে থাকার লোভে হোমওয়ার্ক মিস করা শুরু করলাম। সব সময় থার্ড বেঞ্চের কর্নারের দিকে বসতাম এবং শাস্তিস্বরূপ আমাকে বেঞ্চের ওপর যখন কানে হাত দিয়ে দাড়িয়ে থাকতে হতো তখন অতিশয় আনন্দিত হয়ে তাকিয়ে থাকতাম নাজনীন ম্যাডামের বুক বরাবর। ম্যাডামের শাড়ির ভাজটা যখন একটু নেমে আসতো, ব্লাউজ ভেদ করে ম্যাডামের বুকের কিছুটা অংশ উন্মুক্ত হয়ে পড়তো তখন মনে হতো এ কোন স্বর্গে আছি আমি! অবশ্য সে স্বর্গে থাকা বেশি দিন স্থায়ী হলো না। একদিন নাজনীন ম্যাডাম টের পেয়ে গেলেন ব্যাপারটা। আর যায় কোথায়! একেবারে রেগেমেগে অস্থির। কিন্তু কি শাস্তি দেবেন ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না।

এমন সময় ক্লাসের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন আক্তার স্যার। তাকে এক নামে স্কুলের সবাই চেনে। তিনি স্কুলের স্পোর্টস আর ড্রিল টিচার। অতিশয় মোটা এ স্যার কি করে স্পোর্টস আর ড্রিল স্যার হলেন সে এক রহস্য। তবে তার প্রধান কাজ ছিল সারা দিন বেত নিয়ে ঘোরা আর ছাত্রদের বেধড়ক পেটানো।

আক্তার স্যারকে ডেকে নাজনীন ম্যাডাম বললেন, স্যার জানেন, এ ছেলে কতো বড় বেয়াদব! প্রতিদিন বেঞ্চের ওপর দাড়িয়ে আমার *ইয়ের* দিকে তাকিয়ে থাকে।

আক্তার স্যার বললেন, *ইয়ের দিকে মানে?*

ইয়ের দিকে মানে কি সেটা আর নাজনীন ম্যাডামকে বোঝাতে হলো না। আক্তার স্যারের চোখ অটোমেটিকালি গিয়ে পৌছালো নাজনীন ম্যাডামের ইয়ের ওপর। স্যার মোটা হলেও যথেষ্ট লম্বা। আমি বেঞ্চের ওপর দাড়িয়ে যে দৃশ্য দেখে পুলকিত হতাম, তিনি দাড়িয়েই সে দৃশ্য দেখতে পেলেন। চোখ বড় বড় করে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। হঠাৎ প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। স্যারের উত্তেজনা কোনদিকে প্রবাহিত হয়েছিল সেটা টের পেয়েছিলাম আরেকটু বড় হবার পর। তবে সেদিন স্যার উত্তেজনা প্রশমন করার জন্য ঝাপিয়ে পড়লেন আমার ওপর। ইচ্ছা মতো আমাকে বেত্রাঘাত করলেন। সহ্য করতে পারলাম না, ব্যথায় কেদে ফেললাম। এতে হঠাৎ করে নাজনীন ম্যাডামের মন বিগলিত হয়ে গেল।

তিনি স্যারের কাছ থেকে আমাকে টেনে নিয়ে বললেন, আহা, একটা ছোট ছেলেকে এভাবে মারতে হয় নাকি?

কথায় আছে মেয়েরা মায়ের জাত।

নাজনীন ম্যাডাম আমাকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন, আহা, ব্যথা লেগেছে খুব তোমার?

আমি তখন লক্ষ্য করলাম আমার পুরো মুখমণ্ডল নাজনীন ম্যাডামের বুকের ওপর। এ যেন মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি। আমার চোখ দিয়ে তখনো পানি বের হচ্ছে। চোখ ট্যারা করে সেই অতিশয় লোভনীয় বস্তুটি দেখতে লাগলাম আর গালের এক পাশ সেখানে চেপে রেখে অতিশয় সুপ্ত অংশটি অনুভব করতে লাগলাম। ভুলে গেলাম আক্তার স্যারের কাছ থেকে ধোলাই খাবার কথা। মনে হলো যেন নরক থেকে স্বর্গে এলাম। তখন থেকেই বন্ধুরা আমার টাইটেল দিল ব্রেস্ট বয়।

ক্লাসের সবাই আমাকে দেখলে বলতো, ওই যে ক্লাসের ব্রেস্ট বয় এসেছে।

তবে ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! ওই ঘটনার পর এতো বছর পার হয়ে গেল তবুও আমার সেই সুপ্ত লোভনীয় বস্তুটি এতো কাছ থেকে দেখার বা অনুভব করার সৌভাগ্য আর কখনো হয়নি। বরং অনেক ক্ষেত্রে এটাই যেন আমার জন্য অনেকটা কাল হয়ে দাড়ালো।

ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় এক মেয়ের সঙ্গে প্রেম করা শুরু করলাম। দেশের ইউনিভার্সিটির প্রেম মানেই হলো ক্যাম্পাসের ঝোপের মাঝে বসে টেপাটিপি করা। ক্যাম্পাসের সব প্রেমিক-প্রেমিকা তাই করে বলে জানি ও এতোদিন দেখতাম। অথচ আমি যেই করতে গেলাম, অমনি আমার প্রেমিকা শক্ত করে হাত ধরে বললো, ছি ছি, তুমি এতোটা নীচ, আগে জানলে...।

আমার আর প্রেম করা হলো না।

বন্ধুরা বললো, কিরে ঘটনা কি, ছ্যাকা খেলি ক্যান?

আমি তখন কিছু বলতে পারি না।
এক সময় ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল। ক্যাম্পাসে বন্ধুরা আমার নাম দিল *দি ব্রেস্ট ম্যান*। আমি মনে মনে বললাম, কি আজব! ধরতেই পারলাম না জিনিসটা আর টাইটেল হয়ে গেল ব্রেস্ট ম্যান?
সময়ের পরিক্রমায় এক সময় আমেরিকায় এলাম। আমেরিকা আসার পর পরই দেখি চারদিকে কতো সেক্সি মেয়ে। একটার চেয়ে যেন আরেকটা বেশি সেক্সি। কিন্তু বুঝে উঠতে পারলাম না কিভাবে তাদের সঙ্গে খাতির করা যায়। একবার ক্যাম্পাসের এক পার্টিতে বন্ধুরা আমেরিকান মেয়ে পটানোর সিসটেম আমাকে শিখিয়ে দিল। বললো, এখানে মেয়েদের পটানোর জন্য মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে হবে। তাদের সেক্সি বলে ডাকতে হবে, শরীরের প্রশংসা করতে হবে যেমন কোনো মেয়ে দেখলে বলবে, ওয়াও, ইউ আর সো সেক্সি। কিংবা ইউ গট বিউটিফুল বুবস। Boobs অর্থ ব্রেস্ট।
বন্ধুদের কথা অনুযায়ী সেভাবে কথা বলার সিদ্ধান্ত নিলাম। তবে কোনো মেয়েকে সরাসরি বলার আগে রিহার্সালস্বরূপ একটি ছেলের সামনে গিয়ে একটি মেয়েকে দেখিয়ে হাসিমুখে বললাম, ওয়াও, লুক অ্যাট দ্যাট গার্ল। শি গট বিউটিফুল বুবস, রাইট?
অমনি দেখি নেগেটিভ রিঅ্যাকশন। ছেলেটি আমার কলার চেপে বললো, ফাক ইউ ম্যান। দ্যাট গার্ল ইজ মাই ফ্রেন্ড। আমার গার্লফ্রেন্ড নিয়ে উল্টাপাল্টা কথা কস? তোর তো সাহস কম না? বলেই ধপাস করে চোয়াল বরাবর একটা ঘুষি বসিয়ে দিল।
পরদিন আমার গাল ফোলা দেখে বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করলো, ঘটনা কি?
আমি কিছু বলতে পারলাম না। তবে ঘটনা জানাজানি হয়ে গেল। তারা আমাকে নিয়ে হাসাহাসি শুরু করে দিল। আমার একটা টাইটেল দিয়ে বসলো, বুবস ম্যান। মনে মনে বললাম, আরে, এ কি জ্বালা? বুবস ধরা দূরের কথা, বুবস নিয়ে কমেন্ট করতে গিয়ে ঘুষি খেলাম আর ব্যাটারা আমার টাইটেল দিল বুবস ম্যান?
অনেক চেষ্টার পর এক সময় একটা গার্লফ্রেন্ড জুটলো। সৌভাগ্যক্রমে আমেরিকান এক সুন্দরী ব্লন্ড মেয়ের সঙ্গে প্রেম হলো। ভাবলাম, এখন আর কে পায় আমাকে! আমেরিকান মেয়ে, নিশ্চয়ই যা ইচ্ছা তাই করা যাবে। কিন্তু এ তো দেখি পুরো বেগম রোকেয়ার আমেরিকান ভার্শন।
প্রেমের দ্বিতীয় দিনই আমাকে বললো, আমি শুনেছি তোমরা ইনডিয়ান সাবকন্টিনেন্টের মানুষরা বেশ কনসারভেটিভ। টিপিকাল আমেরিকানদের মতো নোংরা নও। এ জন্যই তোমাকে আমি বয়ফ্রেন্ড হিসেবে সিলেক্ট করেছি। আমি কিন্তু নোংরামি, সেক্সটেক্স একদম পছন্দ করি না।
আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে মনে মনে বললাম, বলে কি মেয়েটা? কনসারভেটিভ বলতে কি বোঝাচ্ছে? সেক্সটেক্স করতে দেবে তো? নাকি তাও দেবে না? তাহলে আমেরিকান ব্লন্ড মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে কি লাভ হলো?
প্রেমের কিছুদিন যেতে না যেতেই লক্ষ্য করলাম মেয়েটা ভয়াবহ রকমের কনসারভেটিভ। সেক্সটেক্স তো দূরের কথা, একটা কিস পর্যন্ত খেতে দেয় না। শুধু তাই নয়, বাইরে এক সঙ্গে বের হলে কথায় কথায় বলে, এই, তুমি ওই মেয়ের দিকে তাকাচ্ছো কেন? আমি দেখলাম তুমি ওই মেয়ের বুবসের দিকে তাকিয়ে আছো।
মুখ ফ্যাকাশে করে বলি, কি বলো এসব? আমি আবার কার বুবসের দিকে তাকালাম?
মেয়েটি রাগী গলায় বলে, আমি দেখেছি তুমি যেখানে যাও সেখানেই মেয়ে দেখলে স্ট্রেইট তার বুকের দিকে তাকিয়ে থাকো। ছি ছি, এ জন্যই বলি তোমাকে কেন তোমার বন্ধুরা বুবস ম্যান বলে ডাকে।
মনে মনে বলি, এ তো বড়ই মুসিবতে পড়লাম!
যাই হোক। এভাবে দিন যেতে লাগলো। কোথাও এক সঙ্গে বের হলে একদম মাথা নিচু করে হাটি। মাথা তুললেই যদি সে চিৎকার করে বলে, এই তুমি ওই মেয়ের বুবসের দিকে তাকালে কেন?

হায়রে কপাল আমার! আমেরিকান ব্লন্ড মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে শেষ পর্যন্ত মোল্লা সাজতে হচ্ছে। যা হোক, এরপর অনেক ইনিয়ে বিনিয়ে অনেকভাবে চেষ্টা করলাম তার সঙ্গে সেক্স করার। কিন্তু কোনোভাবেই তাকে ম্যানেজ করতে পারি না।

শেষ পর্যন্ত সে রাজি হলো।

বললো, ঠিক আছে, তোমার ইচ্ছা পূরণ হবে বেবি তবে এ জন্য তোমাকে ভ্যালেনটাইনস ডে অর্থাৎ ভালোবাসা দিবস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

মনে মনে বললাম, মন্দ নয়। এতোদিন পর যে রাজি হয়েছে সেটাই যথেষ্ট।

অপেক্ষা করতে লাগলাম ভ্যালেনটাইনস ডে-র জন্য। বেশি দিন বাকি নেই। এক মাসের কম। তারপরও যেন দিন কাটে না। তবে কি আর করা? অপেক্ষা করতেই হবে।

দেখতে দেখতে চলে এলো ভ্যালেনটাইনস ডে। সে আমাকে জানালো দুপুরে আমার বাসায় আসবে। অধীর আগ্রহে তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। ঠিক এমন সময় হঠাৎ দরজায় নক করার শব্দ শুনতেই লাফ দিয়ে গিয়ে দরজা খুললাম।

না, সে নয়। আমার ফ্ল্যাটের পাশের বাড়ির মেয়েটা। দরজা খুলতেই সে আমাকে টিপিকাল আমেরিকান স্টাইলে হাক দিয়ে বললো, হ্যাপি ভ্যালেনটাইন। আমি যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে বিদায় করলাম। কোন সময় আমার গার্লফ্রেন্ড চলে আসে ঠিক নেই। এ মেয়েটি এখন কেন আমাকে এতো হাসিমুখে হাক দিচ্ছে কে জানে? সে তো প্রয়োজন ছাড়া কখনো আসে না আমার বাসায়। হয়তো গাড়ি স্টার্ট দেয়ার জন্য জাম্পার কেবল লাগবে কিংবা তার সেলফোনে আর মিনিট নেই, একটা ফোন করতে হবে - এ রকম কোনো প্রয়োজন হলেই আসে। এবার কি ধান্ধা কে জানে। আমি কিছু বলার আগেই সে বললো, হেই, তুমি কি আমার মধ্যে কোনো চেঞ্জ দেখতে পাচ্ছ না?

আমি তার দিকে তাকিয়ে বললাম, কই না তো।

সে বললো, ভালো করে তাকিয়ে বলো। লুক অ্যাট মাই বুবস। আজ আমার ব্রেস্ট ইমপ্লান্ট করে ফিরলাম। এখন কি সুন্দর আর বড় দেখাচ্ছে লক্ষ্য করছো?

আমি এবার তার বুকের দিকে তাকাতেই লক্ষ্য করলাম পরিবর্তন। ভদ্রতা করে বললাম, ইয়া, দে লুক গুড।

এরপর সে আমাকে অবাক করে দিয়ে তার জামা পুরো তুলে বললো, ধরে দেখো, ধরে বলো তো এটা কি ফেইক (Fake=কৃত্রিম) বুবস মনে হয়? আমি পনেরোশ ডলার খরচ করে আমার বুবস বড় করেছি। একটু ভালো করে ধরে টিপে বলো তো এটা যে ফেইক সেটা কি বোঝা যাচ্ছে?

আমি ইতস্তত করতে লাগলাম। সে বললো, কাম অন, ধরে দেখো। সবাই তোমাকে বুবস ম্যান ডাকে। তুমি অবশ্যই বুবসের ব্যাপারে এক্সপার্ট। এজন্যই তোমার কাছে প্রথম এসেছি বুবস দেখানোর জন্য। ধরো ধরো, বলে সে আমার দুটো হাত টেনে এনে চেপে ধরলো তার বুকের ওপর। বললো, কাম অন, ফিল ইট মি. বুবস ম্যান। টেল মি ইফ ইট ফিলস ন্যাচারাল।

ঠিক এমন সময় আমার গার্লফ্রেন্ড এসে হাজির। হাতে এক গোছা গোলাপ। আমার হাত দুটো তখনো ওই মেয়ের বুবসের ওপর। চোখেমুখে পুরোপুরি আতঙ্ক। আমার গার্লফ্রেন্ড এক মুহূর্তের জন্য যেন থতমত খেলো। তারপর চোখেমুখে আগুন ঝলসে উঠলো। গোলাপগুলো ছুড়ে মারলো আমার দিকে।

চিৎকার করে বললো, ফাক ইউ বুবস ম্যান।

বলেই সে চলে গেল।

আমার পুরোপুরি হৃদয়ভঙ্গ হবার অবস্থা। কিন্তু করার কিছুই নেই। পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটির বুবস থেকে হাত নামালাম।

মেয়েটি খুবই স্বাভাবিকভাবে বললো, এবার বলো তো, হাউ আর মাই নিউ বুবস?

আমি ফ্যাকাশে গলায় বললাম, এর আগে কখনো কোনো রিয়াল বুবস ধরিনি। এই প্রথম কোনো বুবস ধরলাম। আই ফেল্ট লাইক আই টাচড টু হিউজ অ্যান্ড হার্ড কোকোনাট। আমি এতোদিন জানতাম মেয়েদের বুবস হলো খুবই সফট, টেন্ডার এমন একটা জিনিস যা ধরলেই ছেলেদের সেক্স অটোমেটিকালি রাইজ করে। আজ প্রথম কোনো মেয়ের বুবস ধরে জানলাম মেয়েদের বুবস হলো হার্ড, হিউজ কোকোনাটের মতো একটা জিনিস যেটা ধরলেই যে কোনো ছেলে সেক্স কি জিনিস সেটা ভুলে যাবে।

মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে হুঙ্কার দিয়ে বললো, ফাক ইউ! ইউ ডোন্ট নো এনিথিং অ্যাবাউট বুবস। বলেই মেয়েটি চলে গেল।

আমার গার্লফ্রেন্ডকে ফোন করলাম। তাকে খুলে বললাম সব কিছু, অনেকভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলাম। তার একই কথা, ছি ছি, তুমি এই ভালোবাসার দিনে আমার সঙ্গে চিট করলে? আরেকটা মেয়ের সঙ্গে সেক্স করলে?

বললাম, সেক্স করলাম কোথায়, জাস্ট তার ফেইক বুবসে হাত দিয়েছি, তাও সে জোর করে ধরিয়ে দিয়েছে বলে।

সে বললো, একই কথা। একটা মেয়ের বুবসে হাত দেয়া আর তার সঙ্গে সেক্স করা একই কথা।

না। তুমি আমাকে এভাবে অভিযুক্ত করতে পারো না। কারণ সেটা তার রিয়াল বুবস নয়। ওটা ফেইক বুবস। আমার কাছে মনে হচ্ছিল আমি দুটো কোকোনাট ধরে আছি। কোনো বুবস ধরেছি বলে মনেই হয়নি।

আমি পারলাম না কোনোভাবে তাকে বোঝাতে। ভালোবাসার দিনে গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে সেক্স তো হলোই না বরং সম্পর্ক গেল ভেঙে।

কিছুদিন পর বন্ধুদের মাঝে জানাজানি হয়ে গেল গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে আমার ব্রেকআপ হয়ে গেছে। বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করলো, ঘটনা কি?

আমার সেই আগের মতো অবস্থা – বলতে পারি না। তবে ঘটনা জানাজানি হয়ে গেল।

সবাই আমাকে দেখলেই হাসে। বলা শুরু করলো, হেই বুবস ম্যান, ইউ হার্ড হোয়াট হ্যাপেন্ড। ইউ আর সামথিং।

আমি তখন বিরক্ত হয়ে চিৎকার করে বলি, হেই, ডোন্ট কল মি বুবস ম্যান, কল মি কোকোনাট ম্যান।

অস্টিন, টেক্সাস থেকে

htouhid@yahoo.com

ভ্যালেনটাইনস ডে

– লিয়াকত হোসেন

ভালোবাসা দিবস বা *ভ্যালেনটাইনস ডে* প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের সময়কাল থেকেই পালিত হয়ে আসছে। প্রাচীন রোমে ফেব্রুয়ারির ১৪ তারিখ রোমান দেবদেবীর সম্মানে ছুটির দিন বলে গণ্য হতো এবং রোমে ওই দিনটি *বিবাদ দিবস* হিসেবে পালিত হতো। ১৫ ফেব্রুয়ারি শুরু হতো *লুপার্কালিয়া* উৎসব। সে সময় তরুণ-তরুণীদের মেলামেশা সহজ ছিল না। তবে *লুপার্কালিয়া* উৎসবে তরুণীরা একটি জারে বা মাটির পাত্রে স্বীয় নাম লেখা চিরকুট রাখতো। প্রতিটি অপেক্ষমাণ তরুণ ওই জার থেকে একটি চিরকুট উঠিয়ে নিতো। চিরকুটে যে মেয়েটির নাম উঠে আসতো সেই মেয়েটিই উৎসব চলাকালীন দিনগুলোতে ছেলেটির পার্টনার হিসেবে বিবেচিত হতো। এভাবেই তরুণ-তরুণীরা পরস্পরের কাছে আসার সুযোগ পেতো। এভাবেই কোনো জোড়ার ভেতর ভালোবাসা গড়ে উঠতো এবং উৎসবের পর উভয়ে বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হতো।

সম্রাট দ্বিতীয় ক্লডিয়াস (Claudius II)-এর সময় রোম রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ও জনবিরোধী কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ে। এ সময় সম্রাট ক্লডিয়াস বিশাল স্বেচ্ছাসৈন্য বাহিনী গড়ে তুলতে বাসনা পোষণ করেন। কিন্তু

রোমানরা কেউই স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, পরিজন ছেড়ে সৈন্য বাহিনীতে যোগ দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেনি। স্বভাবতই সম্রাট রাগান্বিত হলেন এবং এক নীতি গর্হিত আইন জারি করে রাজ্যে বিয়ে বন্ধ করেন। সম্রাট ভেবেছিলেন, বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ না হলে হয়তো অনেকে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে উৎসাহ বোধ করবে। ফল হলো বিপরীত। তরুণ-তরুণীরা এবং রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠই গোপনে বিদ্রোহ করলো। সম্রাটের অযৌক্তিক আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে এগিয়ে এলেন সেইন্ট ভ্যালেনটাইন।

সেইন্ট ভ্যালেনটাইন তরুণ-তরুণীদের মনের বাসনা পূরণ উপলক্ষে গোপনে বিয়ের ব্যবস্থা করেন। একটি ছোট রুম, একটি মোমবাতির আবছা আলো-আধারিতে শুধু বর ও বধূ এবং সেইন্ট ভ্যালেনটাইনের অনুচ্চারিত কণ্ঠে মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে বিয়ে অনুষ্ঠিত হতো। ওদিকে সেইন্ট ভ্যালেনটাইন কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করতেন যাতে মন্ত্র উচ্চারণেও শব্দ না হয় বা ঘটনা রাজার কানে গিয়ে না পৌছায়। কিন্তু একদিন কাঠের সিড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। বিয়েবন্ধনে আসা এক জোড়া তরুণ-তরুণী পালাতে সক্ষম হলেও ভ্যালেনটাইন পারলেন না। রাজপ্রহরীর হাতে বন্দী হলেন। সেইন্ট ভ্যালেনটাইনকে কারাগারে নিক্ষেপ ও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো।

সম্রাট কর্তৃক মৃত্যুদণ্ড পেয়েও ভ্যালেনটাইন মুষড়ে পড়েননি। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সর্বদা হাসি-খুশি থাকার চেষ্টা করতেন। রাজ্যের তরুণ-তরুণীরা কারাগারে এসে তাকে উৎসাহ যোগাতো, ফুলে ফুলে সাজিয়ে দিতো। কারাগারের কারারক্ষী অস্টারিয়াসের মেয়েটিও সাক্ষাৎ করতে যেতো। কারারক্ষী অন্ধ কন্যাকে ভ্যালেনটাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

ভ্যালেনটাইন তার অবসর মুহূর্তে মেয়েটির সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ করতেন। এভাবেই কারারক্ষীর কন্যার সঙ্গে ভ্যালেনটাইনের হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। মেয়েটি উৎসাহ যোগায়, সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ভ্যালেনটাইন ঠিক কাজই করেছেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহই তো করা উচিত।

কারারক্ষীর মেয়ের মাধ্যমে সেইন্ট ভ্যালেনটাইন তার অনুরাগীদের এক চিরকুট পাঠালেন, স্বাক্ষর করলেন, 'Love from your Valentine', চিরকুটটি তিনি লিখেন ১৪ ফেব্রুয়ারি ২৬৯ এ.ডি (14th February, 269 A.D) এবং ওই দিনই রাজার আদেশে ভ্যালেনটাইনকে শারীরিক নির্যাতন ও শিরশ্ছেদ করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

সেইন্ট ভ্যালেনটাইনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলেও ভালোবাসা থেমে থাকেনি, বরং তার মৃত্যুর দিনটি সারা বিশ্বে *ভালোবাসা দিবস* হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

সুইডেনে ভালোবাসা দিবস

সুইডেনে এই দিবসটিকে বলা হয় Alla hjartans dag (Day of Hearsts). পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এদিনটি উৎসবের মতোই পালন করা হয়। মধ্যযুগে এদিনটিতে তরুণরা তরুণীদের প্রেমপত্র, সুদৃশ্য কার্ড বা ফুল উপহার দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। হালকা পানীয় সহকারে নাচের আসরেরও আয়োজন করা হতো। তবে এই আধুনিক যুগে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা হেরফের হলেও এই দিনটিতে ফুল, বই ও অন্যান্য উপহার সামগ্রীর বিনিময় হয়। প্রেমপত্রের ধারাটি অনেকটা হারিয়ে গেলেও মোবাইল, এসএমএস, টেলিফোন এবং ই-মেইলে ভাবের লেনদেন হয়। তবে প্রাচীন যুগের নির্দিষ্ট জার থেকে মানসীর নাম লেখা চিরকুট ওঠানোর মতো রোমাঞ্চ আর নেই।

ভ্যালেনটাইন, ঐতিহ্য

· শতবর্ষ আগে ইংল্যান্ডে ভ্যালেনটাইন দিনটিতে ছোট ছেলেমেয়েরা বড়দের মতো সেজে বাড়ি বাড়ি গিয়ে গান শোনাতো।

Good morning to you, Valentine;
Curl your locks as I do mine ...
Two before and three behind.

Good morning to you, Valentine.

· ১৪ ফেব্রুয়ারিতে তৎকালীন ওয়েলস-এ কারুকার্য পূর্ণ কাঠের চামচ উপহার দেয়া হতো। কাঠের চামচে চাবি, চাবির সুদৃশ্য ছিদ্র ও রঙিন হৃদয় আকা হতো, এর অর্থ 'You unlock my heart'.

· মধ্যযুগে তরুণ এবং তরুণীরা বাটির পেয়ালা থেকে নিজ ভ্যালেনটাইনদের নাম লেখা চিরকুট উঠিয়ে নিয়ে জামার আস্তিনে গেথে রাখতো। এভাবে রাখতো পুরো এক সপ্তাহ।

· কোনো কোনো দেশে তরুণ কোনো তরুণীকে এক টুকরা কাপড় উপহার দিতো। তরুণীটি সে কাপড়ের টুকরো সযত্নে রেখে দিলে মনে করা হতো তরুণের ভালোবাসা সে গ্রহণ করেছে।

· অনেকে বিশ্বাস করতো, ভ্যালেনটাইনস দিনে কোনো মেয়ের মাথার উপর দিয়ে যদি কোনো গায়কপক্ষী উড়ে যায়, তাহলে মেয়েটির বিয়ে হবে কোনো নাবিকের সঙ্গে। কোনো মেয়ে যদি কাক দেখে তাহলে তার বিয়ে হবে কোনো গরিবের সঙ্গে। কিন্তু সুখে থাকবে। যদি মেয়েটি কোনো ফিঙে পাখি দেখে তাহলে তার বিয়ে হবে কোনো ধনবান মিলেনিয়রের সঙ্গে।

· পাচ অথবা ছয়টি তরুণ-তরুণীর নাম পছন্দ করো যাদের তুমি বিয়ে করতে চাও। লাটিমের মতো করে একটি আপেল ঘুরিয়ে নামগুলো আওড়াতে থাকে। আপেলটি থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে নামটি আসবে তাকে বিয়ে করবে তুমি।

· একটি আপেল আড়াআড়িভাবে কাটার পর গুনে দেখো ভেতরে কয়টি বিচি আছে। বিয়ের পর সে কয়টি সন্তান হবে তোমার।

· একটি শুকনো ডানডেলিয়ন (উজ্জ্বল হলুদ বর্ণ ফুল) ফুল হাতে নিয়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে ফু দিয়ে বিচিগুলো বাতাসে উড়িয়ে দাও। যে কয়টি বিচি বাতাসে ভেসে থাকবে সে কয়টি সন্তান হবে তোমার।

ভ্যালেন্টাইন টুকিটাকি

· প্রথম ভ্যালেনটাইন কার্ড পাঠানো হয় ১৪১৫ সালে। পাঠিয়েছিলেন টাওয়ার অফ লন্ডনের বন্দি অর্লেন্সের ডিউক চার্লস তার স্ত্রীকে।

· আমেরিকায় প্রায় প্রতি বছর এ উপলক্ষে এক বিলিয়ন কার্ড লেন-দেন করা হয়।

· ভ্যালেনটাইনস ডের উপহার কেনার ব্যাপারে মেয়েরাই অগ্রগামী।

· সমগ্র পৃথিবীতে এ দিনটিতে প্রায় পঞ্চাশ মিলিয়ন গোলাপ কেনা বেচা হয়।

liakathossain@stockholm.com

শেষ চিঠি

– রাজু

প্রিয় রামছাগল,

কেমন আছিস তুই? ভালো থাকলে ভালো। আমার রাত-দিন চলে যাচ্ছে চিরায়ত গতিতে। তোকে গত চিঠিতে সুবর্ণার ব্যাপারে লিখেছিলাম। আজ তোর হাতের চিঠি পেয়ে আবার লিখতে বসলাম।

আচ্ছা বলতো, এতো কিছুর পরও তুই কিভাবে এ রকম নীরব-নিশ্চুপ থাকতে পারিস? যাকে তুই পাগলের মতো ভালোবাসতিস সে তোর অনুপস্থিতিতে অন্য ছেলের সঙ্গে ঘর বাধতে যাচ্ছে। অথচ তুই দেশে থাকা অবস্থায় দেখেছি সে যেন তোকে ছাড়া বাচতেই পারবে না! তুই তার প্রতি মুহূর্তের খবর জানার জন্য এই তো সেদিনও ব্যাকুল হয়ে আমাকে ফোন করতি। কিন্তু এখনকার এই চরম খবরেও তুই চুপ!

তোর হয়েছেটা কি? তোর এই নীরব সব অবস্থা সয়ে যাওয়া স্বভাবের জন্যই তোর ওপর আমার সাংঘাতিক রাগ হয়। আরে, আজকাল লোকে প্রেম করে শরীর আর ধনের আশায়। তোর ওই *ভালোবাসায় মন প্রধান* মার্কা সেকেলে নীতির ভাত নেই। কতোবার তোকে বলেছি, সুবর্ণার মতো সর্বদা চঞ্চল মেয়ে তোর জন্য নয়। তুই কেন? কোনো পুরুষের সঙ্গেই সে বেশিদিন টিকে থাকতে পারবে না।

এক অর্থে ভালোই হলো, সে তোকে ছেড়েছে। আমরাও মনে মনে এটাই চেয়েছিলাম। শোন, যা হওয়ার হয়ে গেছে। এখন সব ভুলে ভালো থাকতে চেষ্টা কর। তোর শুভ কামনায় বিদায়...।

শত্রুরূপী প্রিয় বন্ধু

মোহন

বিশেষ দ্রষ্টব্য : রামছাগল ছাড়া এ মুহূর্তে তোর জন্য অন্য কোনো অর্থপূর্ণ সম্বোধন পাওয়া গেল না। আমরা বন্ধুরা শব্দ খুজছি। অন্য শব্দ না পাওয়া পর্যন্ত আপাতত এটাই তোর জন্য বরাদ্দকৃত।

সুবর্ণা

মোহনের চিঠিটা তোমার কাছে পাঠালাম। তারা সবাই ভাবছে আমি ভেঙে পড়েছি। কিছুটা খারাপ তো লাগছেই। তবে মনে হয় আমাকে তুমি যতোটা চুরমার করতে চেয়েছো ততোটা করতে সক্ষম হওনি। গত কয়েকদিন থেকেই ভাবছিলাম তোমাকে শেষবারের মতো কয়টা কথা লিখি। কিন্তু মনের সঙ্গে হাতের অসহযোগের কারণে এতোদিন হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া এসব তো তোমার জানা কথা। স্মৃতির জাবর কাটায় তুমি হয়তো আগ্রহী নও। দেয়াল ঘড়িতে রাত তিনটার ঘণ্টা বেজেছে অনেকক্ষণ হলো। অথচ চোখের পাতা মিলছে না। তাই পেন্সিল হাতে নিয়ে বসলাম। জানি না লেখা শেষ করতে পারবো কি না? অথবা লিখলেও তোমাকে পাঠাবো কি না? আর আমার এ চিরকুট তুমি পেলেও তা পড়ার প্রয়োজনীয়তা তোমার থাকবে কি না?

আমি জানি, আমার মাঝে এমন কিছু নেই যার জন্য কোনো মেয়ে আমাকে ভালোবাসতে পারে। তবুও প্রথম দিকে আমাকে নিয়ে তোমার অতি আগ্রহ দেখে ভাবতে শুরু করেছিলাম, দখিনা বাতাস আমার জন্যও বহে, পাখিরা আমার জন্যও গায়। সব কিছুতেই কেমন যেন রঙের ছোয়া দেখতে লাগলাম।

কলেজের সেকেন্ড ইয়ারে তোমার–আমার প্রথম দেখা। আমার অন্য বন্ধুরা যখন মাঠের কোনার দেবদারুর ছায়ায় প্রচণ্ড হইহুল্লড় আর আড্ডাবাজিতে ব্যস্ত থাকতো তখন তাদের একপাশে শব্দহীন একঘেয়ে সময় কাটাতাম। আমার কেন যেন নিজেকে নিয়ে থাকতেই বেশি ভালো লাগতো! তুমি সবে ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হলে। কলেজের অনেক সুপুরুষের মাঝেও তুমি অজানা কারণে আমাকেই বেছে নিলে আর আমি আমাতে থাকলাম না।

বন্ধুদের মাঝ থেকে যেদিন তুমি আমাকে টেনে নিয়ে কলেজের পেছনের পুকুর পাড়ে গিয়ে বসলে সেদিন বন্ধুরা তোমাকে–আমাকে নিয়ে বাজে সব রসিকতা শুরু করলো। অথচ তুমি এতো সুন্দর করে সেসব মানিয়ে নিয়েছিলে, আমারও তোমাকে ভালো লেগে গেল।

তুমি প্রায়ই বলতে, এতো কম কথা বলা মানুষ তোমার ভালো লাগে না। তবুও একদিন আমাদের দেখা না হলে তুমি পাগলপ্রায় হয়ে যেতে। ক্লাস শেষে ভর দুপুরের কড়া রোদেও তুমি রিকশা নিতে না আমার পাশে বেশি সময় হাটতে পারবে বলে। আমার মধ্যমায় তোমার মধ্যমা আঙুল পেচিয়ে পথ চলাতে তুমি যে কি আনন্দ পেতে সে রহস্য চির অজানাই রয়ে গেল।

মনে আছে? শ্রাবণের এক সন্ধ্যায় কাকভেজা হয়ে তোমাদের ব্যালকনিতে আশ্রয় নিয়েছিলাম। তুমি দেখে বার বার ঘরে ঢুকতে বললে।

কিন্তু ভেতরে গেলাম না।

শেষে তুমি আমার পাশেই দাড়িয়ে ছিলে অনেকক্ষণ। ঝুম বৃষ্টি তোমাকে মাতাল করে তুলেছিল।

হঠাৎ করেই তুমি আমাকে বাহুডোরে জড়িয়ে কপালে গাঢ় চুমু একে দিয়ে বলেছিলে, ভালোবাসি তোমায় জীবন দিয়ে। ভালোবাসবো তোমায় জীবনভর।

কিন্তু আমার বিশ্বাসে ভালোবাসার শরীরের চেয়ে আত্মার সম্পর্কের প্রভাব বেশি ছিল বলেই হয়তো দুই হাতে তোমাকে জড়িয়ে ধরতে পারিনি সেদিন।

তুমি রাগে ঠোট ফুলিয়ে বলেছিলে, কাপুরুষ! ভালোবাসার জবাব দিতে জানো না?

হ্যা, আমি কাপুরুষ আর তুমি সুদূর ভবিষ্যৎ পড়তে সক্ষম হিসেবি মেয়ে। তাই তো আজ অন্য পথের পথিক তুমি।

এতোদিন তো আমি একটা আলোর দিকে হেটে চলেছিলাম। মাঝপথে এসে জেনে গেলাম ওটা আলেয়া। আমার পা যেন চলছে না আর। থমকে গিয়ে পাথর মূর্তি হয়ে গেছি।

তোমাকে আমার কোনো প্রশ্ন নেই। কিইবা আমার আছে? শুধু ভালোবাসায় তো জীবন চলে না। জীবনের জন্য যা প্রয়োজনীয়, তুমি তার দিকেই ছুটছো। আমার প্রেম তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষার কাছে সেই কবেই হার মেনে গেছে!

সউদি আরব থেকে
sopnotory@yahoo.com

ঝড়

– মোহাম্মদ রুস্তম আলী

বয়স্ক পিতার একমাত্র সন্তান হওয়ায় কোনোদিন ভবিষ্যৎ চিন্তা করিনি। বাবা বেচে থাকার সময় লোকজন বলতো, হাজির সম্পদ কে খাবে? রুস্তম একা কতো খাবে? বাবার মৃত্যুর কয়েক বছরের মধ্যে চাকরি পাই। সে কারণে তখন ভবিষ্যৎ চিন্তা করার প্রয়োজন হয়নি। দুহাত ভরে খরচ করেছি, সঞ্চয় করিনি।

আগস্ট ১৯৯৮ বড় ছেলে মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া অসুস্থ হলে তাকে নিয়ে চাপাই নবাবগঞ্জের ডা. এমদাদুল হক, ডা. আনোয়ার জাহিদ ও ডা. ময়েজ উদ্দীনের কাছে পরীক্ষা–নিরীক্ষা করিয়ে নিশ্চিত হই তার দুটি কিডনি নষ্ট হয়েছে। তারপর তাকে নিয়ে রাজশাহী মেডিকাল কলেজ হসপিটালের কিডনি বিশেষজ্ঞ ডা. শামীম আহম্মেদের কাছে যাই। কিছুটা সুস্থ হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য কিবরিয়াকে নিয়ে হান্নান মাস্টারের সঙ্গে ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের ভেলরে অবস্থিত কৃশ্চিয়ান মেডিকাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালের কিডনি বিশেষজ্ঞদের শরণাপন্ন হই। পরীক্ষা–নিরীক্ষা করে তারা একটি কিডনি সংযোজনের পরামর্শ দেন।

দেশে এসে সে কিছুটা সুস্থ থাকে। কিডনি ও অর্থ সংগ্রহে দেরি হওয়ায় ১৯৯৮–এর নভেম্বরে সে আবার অসুস্থ হয়। তখন ঢাকা সিএমএইচ–এর কিডনি বিভাগে কর্মরত এক বন্ধু মেডিকাল এসিস্টান্ট আবুল বাশারের সঙ্গে যোগাযোগ করে ছেলেকে নিয়ে বন্ধু সাদেকসহ ঢাকা যাই। ঢাকা সিএমএইচ–এর কিডনি বিভাগের প্রধান ডা. মেজর আমজাদ হোসেন ফকিরের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা চলে। তিন মাস হেমোডায়ালিসিস–এর মাধ্যমে রক্ত পরিষ্কার ও কয়েক ব্যাগ রক্ত দেয়া হয়। ঢাকায় চিকিৎসা চলাকালীন বন্ধু বাশারের বাসায় ছেলে অবস্থান করে। তার স্ত্রী রুবী নিজের ছেলে মনে করে আন্তরিকতার সঙ্গে সেবা করে। যার ঋণ আমরা কোনোদিনও শোধ করতে পারবো না। ওই সময় কিডনি বিশেষজ্ঞ ডা. মতিউর রহমান পরামর্শ দেন যে, অতি শিগগিরই কিডনি সংযোজন প্রয়োজন। আমি সিএমএইচ–এর কিডনি বিভাগের কয়েকজন কিডনি সংযোজিত রোগী এবং তাদের কিডনিদাতার সঙ্গে আলোচনা করে ডা. আমজাদ হোসেন ফকিরের পরামর্শে নিজেই কিডনি দানের মনস্থ করি এবং কলকাতাতেই কিডনি সংযোজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে বন্ধু সাদেক ও আক্তার হাজীকে সঙ্গে নিয়ে ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ কলকাতার পথে রওনা দিয়ে ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার সম্মতিনগরের কাঞ্চি দাদার সহযোগিতায় কলকাতা পৌছাই। সেখানকার বেলভিউ ক্লিনিকের কিডনি বিশেষজ্ঞ ডা. অরূপ রতন দত্তের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা, পরীক্ষা–নিরীক্ষা শেষে ৩ মার্চ ১৯৯৯ আল্লাহর অশেষ কৃপায় সার্জেন্ট ডা. শশাংক শেখর সাহার নেতৃত্বে সাতজন ডাক্তারের সমন্বয়ে ছেলের কিডনি সংযোজন সম্পন্ন হয়। উপস্থিত সাহায্যকারী ছিল আক্তার হাজী, বন্ধু সাদেক ও হান্নান মাস্টার। দুদিন পর সুবেদ মহরীর সঙ্গে ছোট ভাই খাইরুল পৌছে। কয়েকদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে বন্ধু সাদেক ও আক্তার হাজী দেশে চলে আসেন। আমি এক সপ্তাহ পর হাসপাতাল

থেকে ছাড়া পেয়ে ছেলেকে এক নজর দেখে ও কথা বলে এহিয়া ও তার ছেলের সঙ্গে দেশে আসি। ছোট ভাই খাইরুল ও হান্নান মাস্টার ছেলের সাহায্যার্থে কলকাতায় অবস্থান করে। ছেলে দুসপ্তাহ পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে ঠাকুরপুকুরে রবিয়েল মণ্ডলের ভাড়া বাড়ি থেকে হান্নান মাস্টারের সহায়তায় প্রয়োজনীয় চেকআপ করাতে থাকে। ঈদুল আজহার আগে হান্নান মাস্টার দেশে আসেন। একাই খাইরুল থেকে যায় ছেলেকে সাহায্য করার জন্য। দুই মাস পর আক্তার হাজী কলকাতা যান এবং ছেলে সুস্থ হলে ছোট ভাই খাইরুলসহ তাকে নিয়ে দেশে ফিরে আসেন।

পরবর্তী সময়ে চেকআপের জন্য প্রতিবছর দুই-তিন বার ছেলেকে কলকাতা যেতে হয়েছে। প্রতিবারই সে ডাক্তার হাজীর সঙ্গে যাওয়া-আসা করেছে। তিনি দাতা হাতেম তাঈ-এর মতো আমাকে সাহায্য করেছেন। যার ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা আমার পরিবারের পক্ষে ইহ জগতে হয়তো সম্ভব হবে না।

কিডনি সংযোজনের প্রায় সাত বছর হতে চললো কিন্তু ঝড় থামেনি। এরই মধ্যে ছেলে কয়েক বার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে। ২০০০ সালে ছেলের চোখে গ্লুকোমা হলে কলকাতার ডাক্তারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করে। ২০০১ সালে লিভার অ্যাবসেস হলে চাপাই নবাবগঞ্জের ডা. ময়েজ উদ্দীনের চিকিৎসায় ভালো হয়। ২০০২ সালে কালাজ্বরে আক্রান্ত হলে রাজশাহী মেডিকাল কলেজ হাসপাতালের কিডনি বিশেষজ্ঞ ডা. মনোয়ারুল ইসলামের চিকিৎসায় বিশটি ইনজেকশনে (Stibatin) সুস্থ হয়। ২০০৪ সালে আবার কালাজ্বরে আক্রান্ত হলে রাজশাহী মেডিকাল কলেজ হসপিটালের ডা. মনোয়ারুল ইসলামের চিকিৎসায় ৩০টি ইনজেকশন (Stibatin) দেয়ার পরও সুস্থ না হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য ভাগ্নে আমীরের সঙ্গে ছেলেকে কলকাতা পাঠাই। সেখানে ওখহার্ড কিডনি ইন্সটিটিউটে ভর্তি হয়ে কিডনি বিশেষজ্ঞ ডা. অরূপ রতন দত্ত ও কালাজ্বর বিশেষজ্ঞ ডা. অমিতাভ চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে ছেলের চিকিৎসা চলে। ১০ দিন পরে আক্তার হাজী কলকাতায় যান এবং ভাগ্নে আমীর দেশে চলে আসে। তিন সপ্তাহের চিকিৎসায় ছেলে সুস্থ হয় এবং দেশে ফিরে এসে এখন পর্যন্ত আল্লাহর অশেষ দয়ায় ভালো আছে।

১৯৯৮ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত বার বার আমার পরিবারের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গিয়েছে। মহান স্রষ্টার দয়ায়, বন্ধু-বান্ধবের সহযোগিতায় এ দেশের আপামর জনসাধারণের দোয়ার বরকতে আমি ধৈর্য ধারণ করে সে ঝড় সামলে নিতে সক্ষম হয়েছি। এই মহা বিপদে আমাকে যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছে আল্লাহ তাদের যেন উত্তম প্রতিদান দেন, এ কামনা করি।

বর্তমানে দেশে অনেক কিডনি রোগী আছে কিন্তু মাত্র একটি কিডনির জন্য কতো জীবন অকালে ঝরে যাচ্ছে। সেই জন্য আকুল আবেদন জানাচ্ছি যে, যে কেউ নিজের একটি কিডনি রোগীকে দান করতে পারেন, এতে কিডনি দাতার কোনো ক্ষতি হবে না। বরং বহু প্রাণ বেচে যাবে। আল্লাহ সে কারণে সকলকে দুটি কিডনি দান করেছেন। যেমন আমি একটি কিডনি দিয়েও আল্লাহর রহমতে সুস্থ আছি।

১২ লক্ষাধিক টাকা খরচ করে সর্বস্বান্ত হয়ে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলাম। ছেলে যখন সুস্থ হয়ে চোখের সামনে ফিরে এলো তখন সব দুঃখ-কষ্ট ভুলে অকৃত্রিম ভালোবাসায় মন প্রশান্তিতে ভরে উঠলো। ভুক্তভোগী ব্যতিরেকে এইরূপ ভালো লাগার অর্থ কেউ বুঝতে সক্ষম হবে না।

প্রতিবছর বাংলাদেশের অনেক কিডনি রোগী ব্যয়বহুল চিকিৎসা চালাতে না পেরে অকালে ঝরে যাচ্ছে। যদি দেশের সরকার ও ধনাঢ্য ব্যক্তিরা গরিব কিডনি রোগীদের জন্য একটি ফান্ড গঠন করেন, তাহলে আমাদের গরিব দেশের অনেক প্রাণ বেচে যাবে।

বাবলাবোনা, কালিনগর
চাপাই নবাবগঞ্জ থেকে

সোনাবৌ

– খন্দকার কবির হোসেন

ঘুম থেকে জেগে প্রথম চোখ মেলেই আমার সোনাবৌ আমার স্বপ্নের রানীকে দেখি। আমার সোনাবৌ যেন স্বর্গ থেকে আসা অপ্সরী, যে ভুল করে পৃথিবীতে এসেছিল। মানুষ এতো সুন্দর হয় তাকে না দেখলে

বুঝতাম না। ভালোবাসা দিবসে আমরা বেড়াতে যাই দূরে নির্জন কোথাও। যেখানে বৌ আর আমি ছাড়া কেউ থাকে না। খোলা আকাশতলে গাছের ছায়ায় তার কোলে মাথা রেখে গল্প করি। বৌ আমার নাক টেনে যখন আদর করে তখন দম বন্ধ করে রাখি যেন পৃথিবীটা এখানেই থেমে থাকে।

আমার রানীর প্রত্যেকটা স্পর্শে আমার কেমন যেন ভরে যায় অজানা ভালোলাগায় দেহমন। একদিন সিদ্ধান্ত হলো আমরা পার্কে বেড়াতে যাবো। তবে একটু অন্যরকম, প্রেমিক-প্রেমিকাদের মতো। দুজন দুই জায়গা থেকে। আমি আগে গিয়ে বসে আছি। বৌ জানতো তার আসতে যতো দেরি হোক না কেন সে না এলে আমি ওখান থেকে উঠবো না। অপেক্ষার ক্লান্তিতে দ হয়ে বসে আছি হাটুতে হাত রেখে মাথা গুজে। হঠাৎ শুনতে পাই, হে স্বর্গীয় দেবতা, আমার আসিতে দেরি হয়ে যাওয়ায় আন্তরিকভাবে দুঃখিত, আমাকে তুমি ক্ষমা করিয়া ধন্য করো।

যেন মন্দিরে গিয়ে কোনো পুণ্যার্থী ক্ষমা প্রার্থনা করছে। তারও মাঝে মধ্যে ভুল হয় কিন্তু যখন ভুলটা ধরা পড়ে তখন এমনভাবে ক্ষমা চায় যে তাতে আমার হাসতে হাসতে দম বন্ধ হয়ে যায়। তার এসব দুষ্টুমি আমার ভীষণ ভালো লাগে। সে আমার পাশে আছে বলেই আমার পৃথিবীটা এতো সুন্দর। প্রার্থনা করি, হে আল্লাহ সে ছাড়া যেন পৃথিবীতে আমার একটি দিনও থাকতে না হয়। আর তাই যদি হয় তাহলে তার আগে যেন আমার মরণ হয়। তাকে ছাড়া আমার জীবন চলার কথা ভাবতেও পারি না।

যদি আমার কোনো ভুল হয় বা তার প্রতি ভুলেও কোনো অন্যায় করি ফেলি তাহলে সে মুখ ভার করে বসে থাকে না বা কেন অন্যায় করেছি এ নিয়ে চেচামেচিও করে না। কোনো সুন্দর মুহূর্তে আমাকে আদর করতে করতে বলবে, এই শোনো, তোমার কি সে কাজটা করা ঠিক হয়েছে। তখন এতো ভালো লাগে যে তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে মনটা। মন চায় তাকে গিলে খেয়ে ফেলি। মানুষ এতোটা ভালো হয় কি করে আমার ভাবনায় আসে না। সে আসলে সিনেমা বা উপন্যাস-এর নায়িকাদের মতো সর্বগুণে গুণান্বিত। আমার সৌন্দর্য, ভালোলাগা, ভবিষ্যৎ, উন্নতি সব কিছু শুধু তার জন্য। মনে হয় তারও ভাবনা একই। ঝর্ণা আমার জীবন, আমার ভালোবাসা, আমার বেচে থাকার অবলম্বন। সে আমার জীবন, চলার পথপ্রদর্শক এবং পরামর্শদাতা। তার অভিমান হয় যখন ছুটিতে বাড়ি যাবো বলেও তারিখ মতো যেতে পারি না। ঈদে কোনো বিশেষ দিনে তাকে নিয়ে বেড়াতে যাবো বলেও পারি না। তবে বুঝিয়ে বললে সহজেই তার অভিমান ভেঙে যায়। কারণ সে জানে তার প্রতি ভালোবাসার গভীরতার কথা এবং সৈনিকদের চাকরি জীবনের কঠিন কঠোরতার কথা। কোনো সেনার প্রয়োজন থাকলেও দায়িত্ব কর্তব্যের জন্য সঠিক সময়ে বাড়ি যেতে পারে না। তখন গোপনে পড়ে দুফোটা চোখের জল। যা হোক বিশেষ উৎসবের দিনগুলোতে যদি ছুটিতে যেতে না পারি তখন ফোন করে বলি কোথাও গিয়ে বেড়িয়ে এসো, মনটা ভালো লাগবে। একথার প্রতিউত্তরে সে বলবে না মশাই, তোমাকে ছাড়া একা স্বর্গেও যেতে চাই না। তুমি বাড়ি এসো তারপর বেড়াতে যাবো দুজন মিলে।

বিশেষ দিনগুলোতে তাকে নিয়ে ঘুরতে খুব পছন্দ করি। তার জন্মদিনসহ বিশেষ দিনে উপহার দিতে খুব ভালোলাগে। ছুটিতে গেলে তাকে পূর্ণ সময় দিই এবং তার কাজে সহযোগিতা করি। বৌকে বলি সারা সপ্তাহ তো আমার জন্য কষ্ট করবে আজ না হয় বিশ্রাম নাও, সংসারের কাজগুলো আমি করি। সে তখন আমার কথা মেনে নিয়ে সুবোধ বালিকার মতো বিছানায় শুয়ে ঘুমায় বা বসে টিভি দেখে। সব কাজ শেষ করে বলি, খিধেয় পেট চো-চা করছে, এসো লক্ষী সোনা দুজনে গোসলটা সেরে খেতে বসবো। সে তখন আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দেয়।

আবার কোনোদিন দূরে দাড়িয়ে আমার কাজ করা দেখে আর হাসে এবং কাছে এসে বলে আমার সোনা তুমি চাকরিতে অনেক পরিশ্রম করো। বাড়িতে আসো একটু শান্তি একটু বিশ্রামের জন্য সুতরাং তুমি গিয়ে বিশ্রাম নাও। এ নিয়ে আমাদের মাঝে মিষ্টি মধুর ঝগড়া শুরু হয়। তারপর সে নিজেই মীমাংসা করে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলে, মাসের পর মাস তুমি কাছে থাকো না। এই কয়েকটা দিন তোমাকে কাছে পাই। আমাকে দূরে থাকতে বলো না, দুজন মিলেই কাজগুলো করি প্লিজ! তার কথা যুক্তিযুক্ত মনে করে

তখন আমি মাংস আর সে ভাত রান্না করে। আমি ঘর মুছি সে ঘর গোছায়। আমি তার শাড়ি পরিষ্কার করি সে আমার শার্ট পরিষ্কার করে। সে আমাকে গোসল করিয়ে দেয় আমি তাকে গোসল এবং চুলে শ্যাম্পু করে দিই। তার শরীর মুছিয়ে চুলে টাওয়েল পেচিয়ে দুজনে খেতে বসি। আমি তাকে খাইয়ে দিই, সে আমাকে খাওয়ায়। খাবার শেষে তাকে ড্রেসিং টেবিলে বসিয়ে ভালো করে মাথা মুছে চুলে তেল দিয়ে আচড়িয়ে দিই। তখন মাঝে মধ্যে সে উদাস হয়ে যায়। বলে, আমাকে তুমি এতো ভালোবাস? বিনিময়ে তোমাকে কতোটুকু ভালোবাসা, কতোটুকু সুখ দিতে পেরেছি। তোমার এতো ভালোবাসা পাবার যোগ্য আমি নই। তখন আমার খুব রাগ হয়, আমিই বা তাকে কতোটুকু ভালোবাসতে পেরেছি, কতোটুকু সুখ দিতে পেরেছি। তিন মাস পর ছাড়া তাকে সময় দিতে পারি না, কাছে পাই না। আমার অবর্তমানে কতোইনা কষ্ট করে সংসার সামলায়।

খাগড়াছড়ি থেকে

ছোট বাড়ি

– স্বপ্ন

বাইরে ঝমঝম করে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। এক সপ্তাহ ধরেই একাধারে বৃষ্টি হচ্ছে। অহনার প্রচণ্ড ইচ্ছা হচ্ছে উঠানে গিয়ে ভিজতে। প্রত্যয় কাছে থাকলে নিশ্চয় তাকে নিয়ে ভিজতো। এখন সে কি করছে? সে কি অহনার মতো বৃষ্টিটা অনুভব করছে। ইশ! একটানা সাত দিন ধরে সে ভিজছে। তার তো ঠাণ্ডা লেগে যাওয়ার কথা। তার আবার একটু ঠাণ্ডাতে টনসিল ফুলে ঢোল হতো। এখনো কি তেমন হয়? কে এখন তাকে আদা চা করে দেয়, জ্বর এলে মাথায় পানি দিয়ে দেয়, মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়? কেমন আছে প্রত্যয় এখন? খুব জানতে ইচ্ছা করে।

অহনার দুই চোখ ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে আসে। বর্ষার মতো করেই জল ঝরতে থাকে। টেলিফোনটা একটানা বেজেই চলছে। অহনার মনে হলো প্রত্যয় ফোন করেছে। ফোন ধরলেই বলে উঠবে, কি করছো তুমি? রান্না? তাড়াতাড়ি রান্না শেষ করো। দেখছো না আকাশটা কি কালো হয়ে গেছে, একটু পরেই বৃষ্টি হবে। আমরা দুজন মিলে বৃষ্টিতে ভিজবো।

না, না, তা কি করে হয়, এই সময় কি ভেজা যায়!

কেন যাবে না, আগে আমরা দুজন ভিজতাম, এখন তিনজন ভিজবো। দেখো, আমাদের সোনামণির কিছুই হবে না।

কি পাগলই না ছিল মানুষটা। একদম ছেলে মানুষ। অহনা ছাড়া যেন প্রত্যয় ছিল অচল, আর এখন?

তার সব কিছু ভালো লাগতো অহনার। মনে হতো পৃথিবীর সমস্ত আনন্দ যেন তার মাঝে লুকিয়ে আছে। নিজেদের মতো হয় পৃথিবীর সকল সুখী জুটির একজন। বিধাতা হয়তো তখন মুচকি হেসে ভাবতো, দাড়াও মেয়ে, মজা দেখাচ্ছি তোমায়।

প্রত্যয়ের দুই চোখে সব সময় স্বপ্ন খেলা করতো। প্রতি রাতেই অহনাকে শোনাতো ছোট মোনাকে কিভাবে সত্যিকারের মানুষের মতো মানুষ বানাবে যার মাঝে থাকবে সততা, অসীম সহনশীলতা আর মানুষের জন্য গভীর অকৃত্রিম ভালোবাসা, আরো কতো কি?

আচ্ছা, প্রত্যয় কি এখনো মোনার অসুখের সময় সারা রাত নির্ঘুম পায়চারি করে, তার কি এখন জানতে ইচ্ছা করে না কেমন আছে তার প্রিয় মানুষ দুজন? কিভাবে চলছে তার সাজানো সংসার? এখনো কি ঘর অগোছালো দেখলে তার রাগ হয়? এখনো কি বৃষ্টির দিনে ভুনা খিচুড়ি খেতে পছন্দ করে। তার কি বলতে ইচ্ছা করে না, অহনা, তুমি আজ জলপাই রঙের শাড়িটা পরবে। কপালে ছোট্ট একটা টিপ, দুই হাত ভর্তি চুড়ি আর খোপায় বেলী ফুলের মালা?

অনেক জানতে চাওয়া রয়ে গেছে তার কাছে। অনেক অভিমান তার ওপর। কেন তাকে এভাবে ছেড়ে চলে গেল? আর যাবেই যদি তবে কেন এতো ভালোবেসেছিলে? কেন এতো স্বপ্ন দেখিয়েছিলে?

আজ অহনার কি হলো? সকাল থেকেই প্রতিটি মুহূর্তে শুধু প্রত্যয়কে ভাবছে। আজ ৩০ সেপ্টেম্বর তাদের বিয়ে বার্ষিকী। ছয় বছর গত হলো আর ভালোবাসার দশ বছর। দশ বছর আগে এ দিনেই তাদের প্রথম দেখা, ভালো লাগা। প্রত্যয় বলতো, আমাদের ভালোবাসার দিন আর বিয়ের দিন একই হবে। হয়েছিলও তাই। সেদিন কি তারা ভেবেছিল আরো একটা বিশেষ দিন যুক্ত হবে এ দিনটির সঙ্গে। সেখানে থাকবে শুধু বেদনা ও অশ্রু।

অহনা বারান্দা থেকে আয়নার কাছে গেল। নিজেকে দেখলো অনেক্ষণ। এই কি সেই অহনা, প্রত্যয়ের অহনা! যাকে দেখলে যে কেউ দুবার চোখ তুলে দেখতো। গত চার বছরে কতো বুড়িয়ে গেছে। নির্ঘুম দুচোখের নিচে পড়েছে কালি। আজ অহনা সাজবে। প্রত্যয়ের মনের মতো করে সাজবে। দুই হাত ভর্তি চুড়ি, কপালে টিপ, খোপায় ফুলের মালা আর জলপাই রঙের শাড়ি।

অনেকক্ষণ ধরে সাজালো নিজেকে। মোনাকেও তৈরি করলো। তারপর মা-মেয়েতে বের হলো একজনের অদেখা, আরেকজনের দেখা সবচেয়ে ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে দেখা করতে।

ছোট মোনা কখনো দেখেনি তার বাবাকে। কিন্তু বাবার সমস্ত ভালো লাগা, মন্দ লাগা সব তার মুখস্থ মায়ের মুখে শুনে।

আজ সে গভীর আগ্রহে মায়ের সঙ্গে চললো বাবার সঙ্গে দেখা করতে।

এতোদিন পর মা রাজি হলেন তার বাবার সঙ্গে তাকে দেখা করানোর জন্য।

ছোট মোনা ঠিক করে রেখেছে বাবাকে দেখামাত্রই দৌড়ে কোলে উঠে অনেক আদর করবে। চুমু দিয়ে ভরিয়ে দেবে বাবার সারা মুখ। বাবার সঙ্গে খেলবে কতো খেলা।

দুজনে পথ থেকে কিনলো সুন্দর এক গোছা শাদা গ্ল্যাডিওলি। বাবার পছন্দের ফুল।

কিন্তু বৃষ্টির মধ্যে মা তাকে এ কোথায় আনলেন। এখানে তো কোনো বাড়ি নেই। এখানে অনেকগুলো চারদিকে ঘেরা দেয়া উচু মাটির স্থান। এগুলো কি? সে কিছুই বুঝতে পারছে না।

একটা ঘেরা দেয়া জায়গায় মা আর মোনা এসে দাড়ালো।

মা ফুলগুলো সেখানে রেখে বললো, মা এটাই তোমার বাবার কবর।

মোনা কিছুই বুঝতে পারছিল না। মা, তো বলেছে, বাবা আল্লাহর কাছে ছোট্ট সুন্দর একটা বাড়িতে থাকে। তাহলে আজ এ কোথায় নিয়ে এলেন মা তাকে?

মায়ের চোখে বৃষ্টির চেয়েও বেশি পানি ঝর ঝর করে ঝরে পড়ছে।

কেন জানি কি ভীষণ এক অজানা কষ্টে ছোট মোনার দুই চোখ বেয়েও মায়ের মতো ঝর ঝর করে ঝরছে জলের ধারা।

swapno_konnya@yahoo.com

বুলুর ভাষা

-মোহাম্মদ মনির উদ্দিন মজুমদার

চাকরির সুবাদে দেশের বিভিন্ন জেলা, উপজেলা সদরে থাকতে হচ্ছে।

আমার স্ত্রী সরকারি চাকরি করেন। ১৯৯২ সালে আমাদের বিয়ে হয়। বিয়ের পর স্ত্রী-ছেলে মেয়ে সঙ্গে নিয়ে কর্মস্থলে বসবাস করার সুযোগ হয়নি। তবে মাঝে মধ্যে দুই তিন মাস পর পর আমার স্ত্রী ছেলে-মেয়েকে নিয়ে আমার কর্মস্থলে আসে এবং সাত-আট দিন থেকে আবার চলে যায়।

এমনি অবস্থায় আগস্ট ১৯৯৮ থকে সেপ্টেম্বর ২০০১ পর্যন্ত প্রায় তিন বছর কক্সবাজার জেলার একটি উপজেলা সদরে আমি কর্মরত ছিলাম।

আমি যেহেতু একা থাকি এবং গৃহ পরিচারিকাদের রান্না পছন্দ করি না, তাই বাচার তাগিদে নিজেই রান্না করে খাই। আমার স্ত্রী মাঝে মধ্যে যখন আমার কর্মস্থলে আসে তখন গৃহকর্মে তাকে সহযোগিতা করার জন্য অনেক খোজাখুজির পর একটি মেয়ের সন্ধান পাই এবং তার মা-বাবাকে বলে আমার স্ত্রী যে কয়দিন

থাকে সে কয়দিন বাসায় কাজ করার জন্য বলি। মেয়েটির মা–বাবা পুরোপুরি এক মাসের বেতন দেয়ার শর্তে মেয়েটিকে দিতে রাজি হলেন।

মেয়েটির নাম বুলবুলে জান্নাত, ডাক নাম বুলু। বয়স আনুমানিক তেরো।

যতোবারই আমার স্ত্রী আমার কর্মস্থলে আসতো ততোবারই বুলুকে পুরো মাসের বেতন দিয়ে সাত আট দিনের জন্য বাসায় আনতাম। সে সারা দিন কাজ করে সন্ধ্যায় তাদের বাড়িতে চলে যেতো। এমনিভাবে প্রায় দুই বছর পর বুলুর মা–বাবা বললেন (আমার স্ত্রী না থাকলেও) সব সময় বুলু আমার বাসায় কাজ করতে চায়। শর্ত হিসেবে তারা বললেন, আমি যেন তার একটি বিয়ের ব্যবস্থা করে দেই।

আমি তাদের এই কথায় রাজি না হয়ে বললাম যে, সব সময় আসার দরকার নেই, তবে মাঝে মধ্যে এসে কাপড়–চোপড় ধোয়া, ঘর মোছা, হাড়িপাতিল ধোয়া এই কাজগুলো করে দিলেই হবে।

আমার এমন কথায় বুলু রাজি হলেও মাঝে মধ্যে না এসে প্রতিদিনই সে বাসায় আসা শুরু করে। কিছুক্ষণ কাজ করে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাড়িয়ে টেবিলের ড্রয়ারে রাখা আমার স্ত্রীর প্রসাধনী দিয়ে সাজগোজ করে সে বাইরে বেড়াতে যায়। আবার কিছুক্ষণ পরে এসে কিছু কাজ করে নিজ বাড়িতে চলে যায়। আমার স্ত্রীর প্রসাধনী ব্যবহারে কখনো তাকে নিষেধ করিনি। শুধু এই ভেবে যে মেয়েটি কষ্ট পাবে। আমারও তো মেয়ে আছে।

মাসের বেতন ছাড়া মাঝে মধ্যে বুলুকে দশ বিশ টাকা হাতে দিতাম। এতে সে খুবই খুশি হতো। মনে হতো যেন সে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ হাতে পেয়েছে।

মাসিক বেতন তো তার মা–বাবাকে দেয়া হতো, তাই ওই টাকা থেকে বুলু নিজের জন্য কোনো কিছু কিনতে পারতো না। দশ বিশ টাকাই তার কাছে মনে হতো নিজের টাকা এবং সে নিজেই তার ইচ্ছা অনুযায়ী খরচ করতে পারতো। এই টাকা দিয়ে চুড়ি, কানের দুল, লিপস্টিক কিনতো এবং বাজার থেকে এসে আমাকে দেখাতো। তার আনন্দ দেখে আমি অভিভূত হতাম।

এতো অল্প টাকা দিয়ে কাউকে এতো বেশি খুশি করা যায়, আনন্দ দেয়া যায় আমি কখনো ভাবতেও পারিনি।

মাঝে মধ্যে সে তার মা–বাবা, ভাই–বোনদের গল্প শোনাতো। কে কখন তাকে কি কি দিয়েছে এই সব কথা বলতো। সারা দিন বাসায় কাজ করলেও সে কিছু খেতে চাইতো না। নিজের ইচ্ছা হলে কখনো সামান্য ভাত খেতো বা বাসায় যদি বিস্কিট, মুড়ি থাকে তাহলে দুই একটি বিস্কিট বা দুই তিন মুঠ মুড়ি খেয়ে সারা দিন পার করে দিতো। কেন জানি আমার মনে হতো সে একমাত্র আমার স্ত্রীর প্রসাধনী দিয়ে সাজগোজ করার জন্য আমার বাসায় কাজ করতে আসতো। সাজগোজ করে সে তার সমবয়সী মেয়েদের বাড়িতে যায় আর মাঝে মধ্যে তাদেরকে আমার বাসায় নিয়ে আসে। সবাই এক সঙ্গে টিভি দেখে। আবার নিজেদের খেয়াল খুশি মতো চলে যায়। আমার বাসায় কাজ করে বিধায় সে তার পরিচিত সবার কাছে খুবই গর্ব করে।

একদিন এসে বুলুর মা–বাবা আবারও বললেন, আমাদের মেয়েটি আপনার দায়িত্বে দিয়ে দিলাম। আপনি তার ভরণ–পোষণ ও বিয়ের ব্যবস্থা করে দেবেন।

আমিও মনে মনে ভরণ–পোষণের পুরো দায়িত্ব নিতে না পারলেও তার বিয়ের দায়িত্বটুকু নিয়েছিলাম। কতো আর লাগবে দশ বারো হাজার টাকা হলেই তো তাকে বিয়ে দিতে পারবো। কিন্তু মনের এই ইচ্ছাটুকু পূরণ করা হলো না, কারণ দুই তিন মাস পরই বদলি হয়ে অন্যত্র চলে যাই।

বুলুকে আমার স্ত্রীও খুবই ভালোবাসতো এবং তার গল্প শুনে খুবই আনন্দ পেতো। বিশেষ করে তার আঞ্চলিক ভাষায় গল্প শুনতে আমরা সবাই খুবই মজা পেতাম। আমার স্ত্রীও মাঝে মধ্যে তাকে নগদ টাকা, কাপড়–চোপড় ও প্রসাধনী কিনে দিতো। আমরা সবাই তাকে খুবই ভালোবাসতাম। তার আচার–আচরণে আমরা বুঝতে পারতাম সেও আমাদের প্রচণ্ড রকম ভালোবাসে।

একদিন খুব কড়া ভাষায় তাকে জিজ্ঞাসা করি, বুলু, তুই এই বাসায় প্রতিদিন আসিস কেন? তোকে না বলেছি মাঝে মধ্যে আসবি।

সে কোনো কথা না বলে চুপ করে রইলো। চুপ করে দাড়িয়ে থাকা দেখে আমি আবারও ধমক দিয়ে আমার প্রশ্নের জবাব চাই। হঠাৎ খেয়াল করলাম তার দুচোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছে। তার দুচোখে অশ্রু দেখে আমার খুবই খারাপ লাগলো। কারণ, কোনো দিন তাকে ধমক দিইনি। সে কষ্ট পেতে পারে এমন কোনো আচরণও করিনি। এমন করার প্রয়োজনও হয়নি, কারণ বাসায় কাজকর্ম কম ছিল বলে সে তার খেয়াল খুশি মতো কাজ করেছে। যা হোক, শান্ত গলায় স্নেহ আদরের সুরে তাকে আবার প্রতিদিন আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম।

এবার সে জবাব দিল,

স্যার, অনের লাই আর ফেট ফোরেদদে। আই এডে ন আইলে, অনেরে ন দেইলে আর ফেট ফোরে।

প্রতিদিন আমার অফিস পিয়নের কাছ থেকে বুলুর আঞ্চলিক ভাষায় দেয়া জবাবটির অর্থ এভাবে পাই, স্যার আপনার জন্য আমার খুবই কষ্ট লাগে। আমি এখানে না এলে, আপনাকে না দেখলে আমার খুবই কষ্ট হয়।

আমি জিজ্ঞাসা করাতে হয়তো সে আমাকে উদ্দেশ করে এমন জবাব দিয়েছে। আমার মনে হয় তার এই জবাব আমার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে ও আমাকে উদ্দেশ করেই দেয়া। এই জবাব আমাদের প্রতি তার অকৃত্রিম ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কি বা হতে পারে?

ভালোবাসা প্রকাশ করার আর কোনো ভাষা তো তার জানা নেই।

কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ থেকে

জলধারার কাব্য

–রায়হান রশীদ অভি

প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে হেটে যাচ্ছি। মাথার ওপর দুই বছর আগের একশ টাকায় কেনা ছাতা যে ছাতার শত ছিদ্র দিয়ে আমার মাথাসহ সমস্ত শরীরে হালকা জলধারা বয়ে যাচ্ছে। ছাতাটার দুটো শিকও ভাঙা। ছাতা থাকা সত্ত্বেও শরীর ভিজে যাচ্ছে ২১ আষাঢ়ের এই অবিরাম বর্ষণে। পরনে থাকা শাদা শার্ট এবং কালো গ্যাবার্ডিন প্যান্টের জন্য হালকা মন খারাপ হচ্ছে। সকালেই অতি মূল্যবান সম্পদ বিশ টাকার ছয় টাকা খরচ করে এগুলো ইস্ত্রি করানো হয়েছে। ইস্ত্রি করানোর ঘণ্টাখানেক পর এখন এগুলোর মধ্যে আমার ছোট শহরের রাস্তার বালু এবং আবর্জনাযুক্ত কালো পানির অস্বাস্থ্যকর অবস্থান। কয়েকটা বাস আর বেবিট্যাকসির চাকার নোংরা পানি প্যান্ট ভিজিয়ে দেয়া সত্ত্বেও আমার ভাবনাহীন হাটা বৃষ্টির কারণে ফুটপাথের দোকানগুলোর সামনের চালের নিচে আশ্রয় নেয়া কিছু উৎসুক চোখকে কৌতূহলী করছে।

আজ মাসের ৫ তারিখ। ছাত্রী পড়ানো বাবদ পাচশ টাকা পাওয়ার কথা। সে জন্যই বিশিষ্ট রড, সিমেন্ট, ঢেউটিন ব্যবসায়ী আনোয়ার সাহেবের বাসার উদ্দেশে প্রবল বৃষ্টির মধ্যেও বের হয়েছি। তার ক্লাস টেন পড়ুয়া ছোট মেয়েটিকে পড়াই। বড়লোকের অতি আদরের কন্যাদের মতো এ মেয়েটি চঞ্চল নয়। শান্ত এবং গোছানো স্বভাবের যার অনেক রহস্যময় কথার মানে ছয় মাসেও ধরতে পারিনি। সে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু রাজুর দূরসম্পর্কের খালাতো বোন। রাজুই এ টিউশনিটা জোগাড় করে দেয়। টিউশনির টাকা দিয়েই ছয় মাস ধরে ব্যক্তিগত ও পড়ালেখার খরচ চালিয়ে যাচ্ছি।

কলিংবেল বাজাতেই নীলু দরজা খুলে দিল। শাড়ি পরা সামান্য সাজগোজ করা নীলুকে দেখে সামান্য হতচকিত হলাম।

ভেতরে ঢুকতেই বললো, স্যার, আপনি একেবারে ভিজে গেছেন। একটু বসুন, আমি শুকনো কাপড়ের ব্যবস্থা করছি। আপনার চোখও প্রচণ্ড লাল হয়ে আছে। জ্বর আসছে নাকি?

বললাম, আমার জ্বর আসছে না। শুকনো কাপড়ও লাগবে না। তুমি বরং একটা তোয়ালে এনে দিয়ে পড়তে বসো।

নীলু তোয়ালে এনে দিয়ে ইতস্ততভাবে বলতে লাগলো, স্যার, আজ পড়বো না। আমার ছোট খালা যার পলা নামের খুব সুন্দর একটা কুকুর আছে তিনি সকালে এসেছেন। তার কথা আপনাকে বলেছিলাম।

ও হ্যা, মনে পড়েছে।

স্যার, আজ সারা দিন তার সঙ্গে বসে গল্প করবো। প্লিজ স্যার, আজ পড়বো না।

নীলুর ইতস্তত ভাব দেখেই বুঝলাম আসার সময় বৃষ্টিতে ভিজে চোখ লাল হওয়ায় আমাকে ছুটি দেয়ার জন্য নীলু মিথ্যা কথা বলছে। কোনো ছোট খালাই আজ সকালে ওদের বাসায় আসেনি। এর আগেও সে এমনটি অনেকবার করেছে।

বললাম, ঠিক আছে। আজ পড়তে হবে না। বরং কাল আসবো। আজ উঠি।

স্যার, মা আপনাকে চা খেয়ে যেতে বলেছেন।

আজ না, অন্যদিন খাবো।

বের হয়ে যাওয়ার সময় নীলু আমার হাতে একটা নীল খাম ও র‌্যাপ করা একটা বক্স দিয়ে বললো, স্যার, এগুলো আপনার জন্য। আমাদের বাসার বাইরে গিয়ে খুলবেন।

এ কথা বলেই সে ছুটে বাসায় ঢুকে গেল। দেখলাম শাড়ি পরা নীলুকে আজ অনেক বড় দেখাচ্ছে।

বৃষ্টি না থাকায় সামান্য হেটে সামনে গিয়ে একটা চায়ের দোকানে বসলাম। চা দোকানের লম্বামতো ছেলেটাকে চা দিতে বলে প্রথমে নীল খামটা খুললাম। চকচকে ছয়টা একশ টাকার নোট বের হয়ে এলো আর এলো একটা চিঠি। পাচটা নোটের বদলে ছয়টা নোটের চিন্তায় বিভ্রান্ত হয়ে চিঠিটা পড়া শুরু করলাম। নীলুর চিঠি। সে লিখেছে :

স্যার

আজ আমার জন্মদিন। খুব ইচ্ছা আমার কোনো এক জন্মদিনে আপনাকে নিয়ে হুড খোলা রিকশায় চড়বো। এবারের জন্মদিনে সেই ইচ্ছাটা পূরণ করতে পারলাম না। যদি রিকশায় চড়তাম তবে ভাড়াটা আমিই দিতাম। আজ যদি কিছুটা সময় হুড খোলা রিকশায় ঘোরেন তাহলে আমার ইচ্ছার কিছুটা পূরণ হবে। সে জন্যই ভাড়া বাবদ একশ টাকা আপনার জন্য দিলাম।

বক্সে আপনার জন্য একটা ছাতা আছে। এটা আমি নিজে গিয়ে কিনেছি আপনার জন্য। ভাঙা ছাতাটা ফেলে কাল থেকে এ ছাতাটা নিয়ে আমাদের বাসায় আসবেন। বৃষ্টিতে ভিজে লাল চোখে পড়াতে এলে আমি প্রচণ্ড কষ্ট পাবো। প্লিজ, বৃষ্টিতে বেশি ভিজবেন না।

আপনি এতো কুজো হয়ে হাটেন কেন? সোজা হয়ে হাটতে পারেন না? আপনার জন্য আমার বান্ধবীরা আমাকে কুজি বলে।

আপনারই নীলু

প্রচণ্ড বৃষ্টিতে হুড খোলা রিকশায় চড়েছি। মধ্যবয়স্ক রিকশাচালক বার বার পেছন ফিরে আমার দিকে বিভ্রান্ত চোখে তাকাচ্ছে। নীল খাম ও র‌্যাপ করা বক্সটাকে আকড়ে ধরে প্রচণ্ড সুখবোধে ছোটবেলা থেকে পৃথিবীর মানুষের দেয়া অজস্র কষ্ট বয়ে বেড়ানো এই আমি অবিশ্রান্ত চোখের জলে ভাসছি। চোখের জল মিশে যাচ্ছে অবিরাম বর্ষণে। কেবলই মনে হচ্ছে, পৃথিবীতে বেচে থাকাটা অনেক আনন্দের। অনেক সুখের।

উত্তর বিনোদপুর সদর, নোয়াখালী থেকে

শীর্ষে

২০০২ সালে এক বছরের ট্রেনিংয়ে এলাম সবাই। কর্মক্ষেত্রের ফাকে এটা যেন আমার কাছে আনন্দের এক মহা মিলন ক্ষেত্র। অনেকের হয়তো ভালো লাগতো না, ট্রেনিং খুব কষ্টকর মনে করতো। কিন্তু বেশ উপভোগ করছিলাম এই ট্রেনিং। চেহারা–সুরত মাশাআল্লাহ খারাপ ছিল না। স্কুল ও কলেজ লাইফে অনেক মেয়েই কাছে ভিড়তে চাইতো। ততো গুরুত্বের সঙ্গে বিষয়টি নিতাম না। হালকাভাবে কিছু কিছু চালিয়ে যেতাম।

ট্রেনিংয়ের সিলেবাস দেখে পাস করবো এ বিশ্বাস ছিল। তাই উপস্থাপনা, প্যারেড পরিচালনা, সবার পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানগুলোতে বক্তৃতা দেয়াতেই বেশি আগ্রহ বোধ করতাম। তাই অল্প দিনেই সবার পরিচিত এবং অনেকের প্রিয়পাত্রে পরিণত হই।

সবার সঙ্গে আন্তরিকভাবে মেশার চেষ্টা করতাম। দুই একজনের সঙ্গে হয়তো একটু বেশি মিশতাম। সেখান থেকেই শুরু। ট্রেনিংয়ের ফাকে চোখে চোখ রাখা, গল্প করা, বাইরে রেস্তোরায় বসে চা খাওয়া চলতে লাগলো।

একদিন তার ঘনিষ্ঠ এক বান্ধবী বললো, সে তো প্রায়ই তোর কথা বলে। ফ্যামিলি থেকে তার বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছে, তাকে তোর কেমন লাগে?

আমিও হাসির ছলে বলে ফেললাম, তার হাসি দেখেই তো আমি পাগল। সে যদি সম্মতি দেয় তাহলে আগামী বন্ধেই অনুষ্ঠান করে ফেলবো।

এই কথাটা ক্যাম্পাসে বাতাসের চেয়েও বেগে প্রচারিত হলো। এতে সে খুবই বিব্রত বোধ করতে লাগলো। তার এই অবস্থা বুঝতে পেরে একদিন ডেকে নিয়ে এক রেস্তোরায় চা খেতে খেতে এর জন্য ক্ষমা চাইলাম। এরপর থেকে এক সঙ্গে পথ চলা, কথা বলা, আড্ডা মারা, চোখে চোখে তাকিয়ে থাকা তো ছিলই, কিছু গিফট লেন–দেন, কিছু মান–অভিমান সমান তালে চলতে লাগলো। কখনো সিরিয়াসলি নিইনি।

একদিন রেস্তোরায় ক্যাবিনে বসে তার সম্পর্কে কি ভাবছি জানতে চাইলো। সে ভেবেছিল Love You জাতীয় কিছু হয়তো বলবো। কিন্তু আমি একধাপ এগিয়ে এক টুকরো কাগজে লিখে দিলাম তোমাকে স্ত্রী হিসেবে পেতে চাই।

এরই মধ্যে শিক্ষা সফরে গেলাম। এক সঙ্গে ঘুরলাম, পাশাপাশি বসে ছবি তুললো। হাটতে হাটতে এক সময় নির্জন একটি ছোট টিলার উচু চূড়ায় বসলাম। সামনে ছিল বড় একটি ঝিল। বেশ চুপচাপ ছিলাম দুজন কিছুক্ষণ। তারপর এক সময় সে তার হাতটি বাড়িয়ে দিল।

হাতে হাত রাখলাম। তার হাতে আলতো করে একটি চুমু খেলাম। তেমন লজ্জা পেল না। বুঝতে পারলাম এই লাইনে পুরনো। তারপর ঠোটে, মুখে চুমু খেলাম।

সেও প্রতিউত্তর দিল।

এ রকম আবেগময় পরিবেশে কতোক্ষণ ছিলাম জানি না। তবে হাতে হাত রেখে অনেক কথা হলো। এক পর্যায়ে সে জানালো, তার পরিবার সম্মতি না দিলে দোতলা থেকে নিচে পড়ে আত্মহত্যা করবে।

আমিও বললাম, তুমি যেখানে আত্মাহুতি দেবে সেখানে আমি তাজমহল তৈরি করবো।

আমার সেই পাখিটির আসল চেহারা দেখলাম কিছুদিন পর। সে সমান তালে আরো দুই তিনজনের সঙ্গে এ রকম সম্পর্ক চালিয়ে যাচ্ছিল। প্রথম প্রথম অস্বীকার করলেও পরবর্তীতে স্বীকার করলো এবং বললো, আমি নির্দিষ্ট কোনো একক প্রেমে বিশ্বাসী নই। প্রতিদিন নতুন প্রেমে বিশ্বাসী এবং নতুন প্রেম নতুন অনুভূতির জন্ম দেয়।

তাকে বোঝালাম এবং আমার দিকে একটু বেশি ঝোকার জন্য বললাম। বললাম, আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হলে তোমাকে পরকীয়া প্রেমের সুযোগ দেবো এবং আমার রুমে আসতে বললাম। ভাবলাম কিছু অনুভূতি দিই। সবাই যখন নতুন অনুভূতি দিচ্ছে।

হস্টেলের বাইরে থাকতাম। যদিও ট্রেনিং ছিল আবাসিক। কিছুদিন পর সে আমার রুমে এলো। অনেক কথা, বিশেষ করে তার বিভিন্ন প্রেমিকদের ইতিহাস, কে কেমন বা কোন ধরনের এ রকম গল্প চলতো।

একদিন রুমে দুজন পাশাপাশি গল্প করতে করতে হাতে হাত রেখে আবেশে দুজন দুজনকে জড়িয়ে নিলাম। পাশে বিছানাতে শুইয়ে তার ঠোট, বুক ও নাভির চারপাশে আমার ঠোট বিচরণ করতে লাগলো। সে এক সময় বিছানায় পড়ে উত্তেজনায় ফোস ফোস করতে লাগলো। নিচের বাধন খুললাম। চরম মুহূর্তের আগে আমার বিবেক সাড়া দিল না। উঠে এলাম।

এরপর থেকে প্রায়ই সে আমার রুমে আসতো নতুন অনুভূতি লেন-দেন করতে। কিন্তু অনেক সুযোগ থাকার পরও চূড়ান্ত পর্ব কখনো সমাধা করিনি।

এদিকে তাকে নিয়ে ক্যাম্পাসে বেশ গুঞ্জন উঠলো। এখন বিব্রত বোধ করতে লাগলাম। অনেকে বলতে লাগলো, এই মেয়ের মধ্যে কি এমন দেখলো যে তাকে নিয়ে মেতে উঠেছে? এরই মধ্যে অন্যদের সঙ্গে তার প্রেম প্রেম ভাব, অনুভূতি বিনিময় সমান তালে চলতে লাগলো। আবার একজন প্রশিক্ষণার্থীও তাকে নিয়ে বেশ গুঞ্জন ওঠালো। সে নাকি তার হস্টেলে তার রুমে কিছুক্ষণ ছিল।

এতে খুশি হলাম এবং হাপ ছেড়ে বাচলাম। তার সঙ্গে কথা বলা, রেস্তোরায় বসে চা খাওয়া, আড্ডা দেয়া কমিয়ে দিলাম। এসব কিছু শুধু ক্যাম্পাসে আমার ব্যক্তিত্ব ঠিক রাখার জন্য। কেননা তার অবস্থান এতো নিচে নেমেছিল, তার সঙ্গে যারা মিশবে সেও বাজে হয়ে যাবে। এক পর্যায়ে সে যে একটি বাজে মেয়ে তাও তাকে বলে ফেললাম। এ কথা বলার উদ্দেশ্য ছিল, দেখি একটু ভালোভাবে চলাফেরা করে কি না। কিন্তু *কয়লা ধুলে যেমন ময়লা যায় না,* তারও একই অবস্থা। কি আর করা! ক্যাম্পাসে তার সঙ্গে মেশা সীমিত করলাম। তবে রুমে প্রবেশাধিকার ছিল যে কোনো সময়।

এরই মধ্যে হঠাৎ করে তার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। বিয়ের চার পাচ দিন আগে হঠাৎ আমার রুমে এসে তার হাতটি শক্ত করে ধরার জন্য বললো। তার হাতটি ধরতে অঝোর ধারায় কান্না শুরু করলো।

সেদিন অনেক কষ্টে তার কান্না থামালাম।

আজ রাতে গায়ে হলুদ, কাল বিয়ে। আজ এসেছে সবার কাছ থেকে বিদায় নিতে। সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শেষে এলো আমার কাছে।

তাকে রিকশায় তুলে তার একটি হাত ধরে বসে রইলাম। উদ্দেশ্য একটু এগিয়ে দেয়া।

তার দেরি দেখে, ছোট ভাই এসেছে তাকে নিতে। সে আমাদের দেখে ফেললো।

নেমে বিদায় জানিয়ে চলে এলাম। ভাবলাম এতো দিনে ঝামেলামুক্ত হলাম। রাতে ঘুমিয়ে আছি। রাতে গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর আমাকে ফোন করলো। আমি ঘুম থেকে উঠে প্রথম তো বুঝতে পারিনি কার ফোন। পরে বুঝলাম সে। তার নাকি খুব কষ্ট হচ্ছে।

সান্ত্বনা দিলাম।

বললাম, আগামী রাতে এমন সময় বাসর হবে। নতুন মানুষ পাবে, ভালো লাগবে।

বিয়ের পর ক্যাম্পাসে ফিরলো। খুব হাসিখুশি দেখলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার স্বামী কেমন? কেমন আদর করে সে? বললো, আপনার আদরের মতো নয়। ভাগ্যিস কাছের কেউ তা শোনেনি। এক প্রশিক্ষণার্থী তার স্বামীকে দেখতে চাইলে আমাকে দেখিয়ে বললো, ওই দেখ আমার স্বামী। অন্য এক প্রশিক্ষণার্থী দ্বারা প্রস্তাব দিয়ে ব্যর্থ হয়ে পরে সরাসরি আমাকেই বললো, আমি যদি তাকে গ্রহণ করি তাহলে তার স্বামীকে ছেড়ে চলে আসবে।

ফিরিয়ে দিলাম।

একদিন সে আমার রুমে এলো। আমিই আসতে বলেছিলাম কি প্রয়োজনে যেন। ঠিক আবার অনুভূতি লেন-দেন হলো। বলেছিলাম তুমি এখন অন্যের বিবাহিত বৌ। এ রকম ঠিক নয়। তার বিশেষ আগ্রহের জন্য তাকে জড়িয়ে ধরলাম, চুমু খেলাম, ঠোটে ঠোট রাখলাম। উচু বুকে নিবিড় পরশে কিছুক্ষণ মুখ রাখলাম।

চলে আসার সময় বললো, আপনি না বলেছিলেন, আপনার সঙ্গে বিয়ে হলে পরকীয়ার সুযোগ দেবেন। কিন্তু আমি আপনাকে দিয়ে পরকীয়া শুরু করলাম।

তারপর দুই বছর কোনো যোগাযোগ নেই। তার পরকীয়ার সংখ্যা কতোয় দাড়িয়েছে কে জানে? কিন্তু দুঃখ নেই, আমিই তো তাদের মধ্যে শীর্ষে।

নাম ও পূর্ণ ঠিকানা বিহীন
সিলেট থেকে

কবর

–বদরুল ইসলাম

অনেক কষ্টে আছি। এই কষ্টের মধ্যেও তোমাকে ভীষণ মনে পড়ছে। মনে পড়ছে অনেক কিছু। সেই তোমার সঙ্গে যেদিন প্রথম দেখা হলো – বিয়ে হলো।

বিয়ের সেই প্রথম দিনের কথা, নানান দিন নয়, সেই প্রথম রাতের কথা কি তোমার মনে পড়ে? তোমার হয়তো মনে নেই, তুমি সারা জীবন ওই একই রকম ছিলে। কোথায় কোন জিনিসটা রাখতে পরক্ষণেই আর মনে করতে পারতে না।

বাসর ঘর। অনাদিকাল থেকে চলে আসা এই আনুষ্ঠানিকতায় মন ভুর ভুর করে উঠেছিল। কাগজের তৈরি আর বাগান থেকে সদ্য তুলে আনা ফুলের সমাহারে ঘরের ফ্লোরোসেন্ট বাল্বের আলো স্তিমিত হয়ে এসেছিল। ছোট ভাইবোনদের হাত থেকে দুএকটা ফুলশর তোমার লজ্জাবনত মুখের ওপর ছুটে আসছিল। লজ্জা আর কৃত্রিম রাগে তোমার চোখে–মুখে ফুটে উঠেছিল এক অপূর্ব রেখা। আড়চোখে আমার অভিব্যক্তি উপলব্ধি করার চেষ্টা করছিলে। বাম চোখের একটি টিপ দিয়ে তোমাকে আরো একটু লজ্জায় ফেলে দিতাম। এ কথা নিয়ে তোমাকে কতো ক্ষেপানোর চেষ্টা করেছি। গোলাপের পাপড়িগুলো বিছানাকে ফুলশয্যায় সাজিয়েছিল। তোমার কি মনে পড়ে সেই বেড অফ ফ্লাওয়ারের কথা!

ফুলশয্যা। আমাদের মুক্তি দিয়ে ওরা ঘর ছাড়লো অনেক রাতে। আমরা শুয়ে পড়লাম। ঘুম এলো না চোখে। ও রাতে নাকি ঘুমাতে নেই। এটাই নাকি নিয়ম। গল্প হলো অনেক। তোমার মনে পড়ে – কি গল্প হয়েছিল। আমার মনে আছে, তেপান্তরের মাঠের গল্প, জুজু বুড়ি, রাজকন্যা–রাখাল বালক, কিং এডওয়ার্ড–মিসেস সিমসন, এমনকি ও পাড়ার ষাট বছরের কাদের মোল্লা আর চোদ্দ বছরের জয়গুনের প্রেমের ঘটনাও বাদ পড়লো না। শুধু মনে করতে পারছি না, সে রাতে বুভুক্ষু দানব দুটো জেগে ছিল নাকি ঘুমিয়েই পড়েছিল।

তোমাকে ভালোবাসা জানাচ্ছি আবার। এ যুগে কিশোর–কিশোরী, যুবক–যুবতীরা বিয়ের আগে ভালোবাসা করতে আগ্রহী এবং করে থাকে। তারপর কারো ভালোবাসা টিকে যায়, প্রেম হয়, বিয়ে হয়। এমন বিয়ে কোনোটা ভেঙে যেতেও দেখা যায়। বুকভরা আশা নিয়ে বিয়ে হলো, সেটা ভেঙে যেতে বুকফাটা আর্তনাদ হয় না। নিষ্ঠুর প্রেম! যাদের প্রেম–ভালোবাসা ব্যর্থ হয় তাদের কেউ চিরকুমার–কুমারী থাকে, কেউ বিষ পান করে, কেউ গলায় দড়ি দেয়, আবার কেউ পাগল হয়ে দেশান্তরী হয়।

বিয়েউত্তর ভালোবাসাই নাকি খাটি ভালোবাসা। আমিও তোমাকে ভালোবাসলাম। গভীরভাবে ভালোবাসলাম। সারাক্ষণ তোমার পাশে পাশে থাকতে কি যে ভালো লাগতো সেটা তোমাকে বোঝাতে পারিনি। আমি আবেগে বাকবাকুম করেছি তোমার চার পাশে, তুমি চোখ মেলে ধরনি পায়রার মতো কোনোদিন। এক মানব আত্মার সঙ্গে অন্য মানব আত্মার মিলন হওয়াই প্রকৃত প্রেম। একতরফা প্রেম মাধুর্যহীন।

মান–অভিমান সব দম্পতির মধ্যেই হয়ে থাকে। মান–অভিমান নাকি প্রেম–ভালোবাসাকে আরো গাঢ় করে। কিন্তু অভিমানটাকে তুমি চিরদিন অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছো। উপলব্ধি করোনি। আমি দুঃখ পেতাম। মানুষ কাচকে হীরা ভেবে প্রতারিত হয়েছে, ব্যথিত হয়েছে। তুমি খাটি হীরাগুলোকে কাচ বলে অবজ্ঞা

করেছো। আমাকে বিশ্বাস করতে চাওনি। আমার অভিমানটাকে তুমি বুঝতে চাওনি। রাগ করে দুই দিন না খেয়ে বিছানা পৃথক রেখেছো। কতো দিন একা বিছানায় কেদে কেদে সকাল করেছি তা গুনে রাখতে পারিনি। বড় বড় ছেলেমেয়েকে নিজের পক্ষে নিয়ে আমাকে নানান দোষারোপ করেছো। মাথা পেতে সহ্য করেছি।

আমার হৃদয় নিংড়ানো স্নেহের ছেলেমেয়ে দুটি ভালো আছে তো? তাদের জন্য প্রাণভরে আশীর্বাদ করি। ফিলিপটা যে ঢাকায় কি করে কিছু বুঝি না। ওর কি বুদ্ধি-সুদ্ধি হবে না? প্রাইভেট চাকরিও তো চাকরি। চাকরির প্রতি সিনসিয়ার হতে হবে, না হলে কি চাকরি থাকে? কিন্তু কথা শুনবে না। তবে মনে হয় বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা কিছু কমিয়েছে। বন্ধুরাই ওর সর্বনাশটা করেছে বেশি। কিন্তু ওটা বিশ্বাস করবে না। এখন তোমাকে কিছু সাহায্য করছে? করলেই ভালো।

এলিস তো মাস্টার্স ফাইনাল পরীক্ষা দিচ্ছে। লেখাপড়াটা ঠিকমতো করছে তো? ওর দোষ পরীক্ষার সময় টেনশন করবে। ওর মাস্টার্সে একটা ক্লাস থাকা দরকার। মেয়েটা আমার কষ্ট করে কিন্তু কি যে চিন্তা করে সব সময়। আমি কিন্তু বুঝি ও কি চিন্তা করে। প্রাচুর্যের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়নি কোনোদিন কিন্তু ওদের তো তা বুঝতে দিইনি কখনো। সেটাই আমার সংসারটা ছারখার করে দিচ্ছে প্রতিনিয়ত। বাচ্চা মেয়েটা কেন যে সেই চিন্তাটাকে নিজের করে নিয়েছে বুঝি না। ওদের কথা মনে হলে আমি কিছুতেই চোখের পানি থামাতে পারি না। ওদের প্রতিষ্ঠা দেখে আসতে পারলাম না। এই দেখো এখনো আমার চোখ দিয়ে অঝোরে পানি ঝরছে।

তোমাদের আমি কষ্টই দিয়েছি। সবাই ভুলে যেও। আমি যে এখানে বড় একা। আশপাশে কেউ সান্ত্বনা দেয়ার নেই। চারদিকে মাটি আর মাটি, এই চুপ চুপ, মুনকির আর নাকির আসছে। এখনই সওয়াল-জওয়াব শুরু হবে। খোদা হাফেজ।

ওয়ালিয়া, নাটোর থেকে

বড়দিদি

–আশিক

সকাল দশটা। মন্দ আবহাওয়া। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি। হাতে ছাতা নেই। জামাকাপড় ভিজে একাকার। ফার্মগেটের যাত্রী ছাউনির নিচে বাসের জন্য অপেক্ষা করছি, যাবো মতিঝিল। অবশেষে বাস এলো কিন্তু সিট খালি নেই। এমনকি দাড়ানোর জায়গা নেই। দরজায় বাদুড়ঝোলা হয়ে ছুটে চলেছি গন্তব্যে। হঠাৎ দেখলাম মাঝবয়েসি এক মহিলা এসে থামলো যাত্রী ছাউনির তলায়। হাতে রঙিন ছাতা। মনে হলো তিনি আমার বীণাপু। আমি শুনেছি বীণাপুর স্বামী কলেজের প্রফেসর, আর তার একটি ছেলে ফার্মগেটে কোনো স্কুলে লেখাপড়া করে। ইচ্ছা হলো নেমে যাই, তার সঙ্গে দেখা করি, কিন্তু ততোক্ষণে বাসের গতি বেড়ে গেছে। আমার আশা পূরণ হলো না।

বীণাপু আমার দুঃসম্পর্কের বোন। তাদের বাড়ি আর আমার বাড়ির মাঝখানে যমুনা নদী। আমাদের নানার বাড়ি সরিষাবাড়ী। বীণাপু কলেজে লেখাপড়া করতো। আমি বার্ষিক ছুটি কাটাতে নানার বাড়ি যেতাম, বীণাপুর সঙ্গে সময় কাটাতাম। বীণাপুর সঙ্গে সর্বশেষ দেখা ১৯৮৮-র বন্যার সময়। সর্বনাশা বন্যা আমার জীবন থেকে বীণাপুকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।

বীণাপু আমায় খুব স্নেহ করতো, আমার সব কিছুতে তার যত্ন ছিল। খাওয়া-দাওয়ার তদারকি, কাপড়-চোপড় ধোয়া, অসুস্থ হলে সেবা করা ইত্যাদি। এ যেন শরৎচন্দ্রের সেই বড়দিদি। আমার প্রতি তার ঠিক তেমনি মনের টান, বিশাল হৃদয়, গভীর চোখ। আমি কতো যে হারিয়ে গিয়েছি তার চোখের মহাসাগরে। ভাবনার অতলে বুনেছি কতো স্বপ্নের রাজপ্রাসাদ। কিন্তু মুখে বলার সাহস ছিল না। কারণ বীণাপু আমার তিন বছরের বড়। বয়সে আমার বড় হলেও বীণাপু এক সময় আমার হৃদয়ের সবচেয়ে কাছাকাছি পৌছে

ছিল। আমি যেমন তার সব কথা মেনে চলতাম সেও আমার সব কথা মেনে চলতো। বীণাপুকে আমার কল্পনার বড়দিদি মনে হতো। তাই তাকে বড়দিদি ডাকতাম।

এক সোনালি সন্ধ্যায় বড়দিদির সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ঝিনাই নদীর ওপর বাশের সাকো পার হয়ে অনেক দূরে। হঠাৎ ঝড় উঠে এলো এবং সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি। দুজনে ভিজে একাকার। ভেজা সালোয়ার-কামিজ বীণাপুর শরীরের সঙ্গে লেপ্টে আছে। শরীরের প্রতিটি ভাজ স্পষ্টভাবে ধরা পড়ছে। লজ্জা, ভয় ও সংকোচে বীণাপু যেমন আমার দিকে তাকানোর সাহস পাচ্ছে না ঠিক আমিও তার দিকে তাকানোর সাহস পাচ্ছি না। শুধু চোরা দৃষ্টিতে একে অপরকে দেখছি।

ঝড়ের তীব্রতায় বাধ্য হয়ে আমরা আশ্রয় নিলাম এক পরিত্যক্ত ভাঙা মন্দিরে। দীর্ঘক্ষণ পরও ঝড় থামার কোনো চিহ্ন নেই, অথচ সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। বাইরে প্রচণ্ড ঝড় আর ভেতরে নিঝুম আধার। আশপাশে কোনো জনমানবের চিহ্ন নেই। নিঠুর পাষাণ ভাঙা প্রাচীর ঘেরা পুরাতন মন্দিরের মাঝে শুধু আমি আর বড়দিদি। এমন বিরান জায়গায় আমি একা হলে ভূত অথবা বিষাক্ত পোকামাকড়ের ভয়ে মরে যেতাম। কিন্তু এখন মোটেও ভয় করছে না, কারণ সঙ্গে আমার সবচেয়ে আপনজন বড়দিদি।

বীণাপু আমার জীবনে এমন এক সময় এসেছিল যখন আমি আমার নাম না জানা প্রেয়সীকে ভাবনার গভীরে বড়দিদি বানিয়ে দিনরাত ডায়রি লিখে যেতাম। যাতে ছিল আমার যৌবনের গান। প্রতিটি শব্দে, প্রতিটি বাক্যে ছিল হৃদয়ের আকুতি-মিনতি। ডায়রির প্রতিটি পৃষ্ঠায় শুরুতে ছিল *বড়দিদি* সম্বোধন। ডায়রিটি আমি সবার দৃষ্টির আড়ালে রাখলেও এমন জায়গায় রাখতাম যাতে বীণাপুর চোখে পড়ে। বড়দিদি আমার ডায়রিটি পড়েছিল। পড়ার পর তার প্রতিক্রিয়া জেনেছিলাম তার লিখিত একটি চিঠিতে। আমি তা পেয়েছিলাম বড়দিদির বিছানার নিচে। বড়দিদির অগোচরে আমি চুরি করেছিলাম চিঠিটি। সে আমাকে ভালোবাসার সম্পূর্ণ অধিকার দিয়েছিল।

আমার কামনার ধন বড়দিদি, যাকে মনে-প্রাণে আপন করে চেয়েছি আজীবন। সে এখন আমার হাতের নাগালে। তাকে নিরিবিলি কাছে পাওয়ার জন্য এর চেয়ে মহান সুযোগ আর কোনোদিন আসবে না। জীবনে এ এক স্মরণীয় মুহূর্ত। এমন পরিস্থিতির জন্য কোনো দিন প্রস্তুত ছিলাম না। আমি মুখ ফুটে বলবো আমার ভালোবাসার কথা? আমি কি আমার অধিকার আদায় করে নেব? প্রহরের পর প্রহর চলে যাচ্ছে অথচ কারো মুখে কোনো কথা নেই। এ যেন নীরব ভালোবাসার আদান প্রদান। আমাদের গোপন ভালোবাসা সারাজীবন গোপন হয়ে রইলো। সন্ধ্যা পার হয়ে এবার নামলো আধার রাত। এ যেন আধারের ওপর আধার, তার ওপর হিমশীতল বাতাস। এখন আর একে অপরকে দেখতে পাচ্ছি না।

অজানা এক আকর্ষণে একে অপরের কাছাকাছি এলাম। এক ভাঙা বেদির ওপর বসে পড়লাম। এখন বীণাপুর শরীরের উষ্ণতা আর ঘন ঘন নিঃশ্বাস শুনতে পাচ্ছি। আমার মনে বার বার কামনা জাগছিল, এই রাতটি যদি থেমে যেতো যুগ থেকে যুগান্তরের তরে। যদি এই ঝড় না থামতো কোনোদিন। বড়দিদির সঙ্গে যদি কাটানো যেতো সারাটি জীবন।

হঠাৎ মনে হলো আমি এখন অজানা কোনো জগতে। যেখানে পুরনো মন্দির পরিণত হয়েছে সদ্য নতুন মন্দিরে। বড়দিদি দেবীর আসনে আসীন, আর আমি তার পায়ে ফুল দিয়ে বসে আছি একধ্যানে। না, তাকে ছুয়ে দেখিনি। দেবীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। শুধু বাতাসে উড়ে আসা তার চুলের সুগন্ধি নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলাম। তার একান্ত সান্নিধ্যে নিজেকে ধন্য মনে হলো।

এক সময় সর্বনাশা ঝড় থেমে গেল। আমি কল্পনার জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরে এলাম। আকাশের কালো মেঘ তড়িঘড়ি করে সরে গিয়ে চাদ মামার হাসি ফুটে উঠলো। আমরা মন্দির থেকে বের হলাম। পিচ্ছিল কাদামাটির ওপর হাটার সময় যেন পড়ে না যাই এ জন্য দুজন দুজনার হাত ধরলাম। এমন নাজুক পরিস্থিতিতে বড়দিদির স্পর্শ পেয়ে আমার শরীর শিউরে উঠছিল। সারা শরীরের কাদামাটি মেখে আমরা যখন বাড়ি পৌছালাম তখন রাত এগারোটা।

দীর্ঘ সময়ের তরে আমাদের এভাবে হারিয়ে যাওয়া নিয়ে বাড়িতে আমাদের কেউ সন্দেহ করেনি। কারণ সৎচরিত্রবান বলে আমার খুব সুখ্যাতি ছিল। আমার চরিত্রকে সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করতো বড়দিদি। বিশেষ করে আজকের এই রাতে যে কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলাম তারপর চরিত্রের সার্টিফিকেট পেতে আর বাধা কোথায়? আমি ভালো মানুষের সার্টিফিকেট পেয়েছি অনেক মূল্যে, যার বিনিময়ে হারিয়েছি বড়দিদিকে।

সর্বক্ষণ আমি আমার মনে একটি দুঃখ বয়ে বেড়াই, তাহলো বড়দিদিকে একান্তে কাছে পেয়ে তাকে গ্রহণ করার সুযোগ হাতছাড়া করে আমি ভুল করেছি। নইলে সে আমার ঘরণী হয়ে থাকতো। একান্ত নিরিবিলিতে কেন আমি ভালোবাসার দাবি আদায় করতে পারিনি তা আমি বলতে পারবো না। আমি কি সমাজের ভয়ে ভীতু ছিলাম। হ্যা, আমি সমাজের কাছে হেরে গিয়েছি। আচ্ছা, চরিত্রের সার্টিফিকেট অথবা বড়দিদিকে আপন করে পাওয়া এ দুটোর মাঝে কোনটি বেশি মূল্যবান?

বড়দিদি যেদিন বধু সেজে অন্যের ঘরে চলে গেল সেদিন রাগে, দুঃখে আগুনে পুড়ে ফেলেছিলাম আমার লেখা ডায়রিটি। বড়দিদির লেখা চিঠিটি ছিড়ে টুকরো টুকরো করে আগুনে ছুড়ে মেরেছিলাম। বড়দিদিকে ভুলে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পারিনি। সামাজিকভাবে এখন তার ওপর আমার কোনো অধিকার না থাকলেও মনের বিচারে সে আজীবন আমার বড়দিদি।

১৯৮৮–র বন্যার পানি ধীরে ধীরে কমতে থাকে এবং এক সময় স্বাভাবিক হয়ে যায় সব কিছু। বন্যার পানি কমার সঙ্গে সঙ্গে আমার ছুটিও শেষ হয়ে যায়। আমি ভগ্ন হৃদয়ে ফিরে আসি আমার সাধারণ জগতে। ১৯৮৮–র বন্যা আমার জীবন থেকে অনেক কিছু ছিনিয়ে নিয়ে গেল। বড়দিদি চলে গেল অনেক দূরে। আমার নাগালের বাইরে। সে আমার জীবনে এক রহস্যময় নারী।

আমার জীবনে অনেকেই আমার বড়দিদি হতে চেয়েছিল। কিন্তু কারো মাঝে তার মতো গভীর ভালোবাসা খুজে পাইনি। বীণাপু আমার মনের মাঝে আমৃত্যু বড়দিদি হয়ে থাকবে।

সউদি আরব থেকে
abuzahrra@yahoo.com

এনগেজড

সেদিন সকালে ঘুম ভেঙেছিল বৃষ্টির শব্দে। বৃষ্টি আমার খুব প্রিয়। বৃষ্টি দেখে সঙ্গে সঙ্গে তার কথা মনে পড়ে গেল আমার। কারণ বৃষ্টি তারও খুব প্রিয়। বিছানা থেকে নেমে বারান্দায় গেলাম বৃষ্টি ধরার জন্য। বৃষ্টি দেখে তাকে ফোন করলাম। ফোন ধরছে না। তার মানে সে এখনো ঘুমের রাজ্যে। তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছে কয়েক মাস হলো। কিন্তু যতো দিন যাচ্ছে, তার প্রতি দুর্বল হয়ে যাচ্ছি। আজকে তার সঙ্গে আমার দেখা করার কথা। কিন্তু যেভাবে বৃষ্টি হচ্ছে, কি করবো বুঝতে পারছি না। তাই তাকে আবার ফোন করলাম। এবার সে ফোন ধরলো।

ঘুম জড়িত কণ্ঠে বললো, কি খবর? আসবে কিভাবে?

বললাম, তুমি আসতে পারলে আমার কোনো সমস্যা নেই।

সে বললো, ঠিক আছে। তুমি বাসা থেকে বের হওয়ার আগে ফোন করো।

বললাম, আমার কোচিং আছে। আমি সেখানে যাবো।

সে বললো, আচ্ছা কোচিং শেষ হলে ফোন করো। তারপর আবার বললো, দেখো, তোমার সমস্যা হলে আমার দরকার নেই।

বললাম, আমার কোনো সমস্যা নেই। কোচিংয়ে যাওয়া লাগবে। কারণ আজ একটা পরীক্ষা আছে। কোচিং শেষে তারপর যাবো।

সে বললো, ঠিক আছে, পরে দেখা হবে।

ফোন রেখে ভাবলাম তাকে দেখার সুযোগ কেন হারাবো। তারপর কোচিংয়ে গিয়ে দেখি আমি ছাড়া আর কেউ আসেনি।

স্যার বললেন, কি ব্যাপার, এই বৃষ্টির মধ্যে না এলেই পারতে। তারপর ক্লাস শেষ হওয়ার পর বের হয়ে তাকে ফোন দিলাম।

সে বললো, আমি রাস্তায়। পনেরো মিনিটে আসছি।

সে এলো। আমার মুখোমুখি বসলো। আলতো করে মাথার পানি ঝাড়তে ঝাড়তে বললো, দেখেছো কি সুন্দর বৃষ্টি?

খুব গম্ভীরভাবে বললাম, না দেখিনি। শুনে সে হা হা করে হেসে উঠলো। তারপর আমরা বসে আড্ডা দিচ্ছি, আমি কোনো একটা ব্যাপার নিয়ে খুব একসাইটেড ছিলাম। হাত পা নেড়ে তাকে কিছু একটা বলছিলাম। হঠাৎ খেয়াল করলাম, সে আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে এবং ঠোটে সেই চিরাচরিত ফাজিল মার্কা হাসি।

বললাম, কি ব্যাপার কি হয়েছে?

সে বললো, না কিছু না। আচ্ছা, তোমার কি প্রেমট্রেম করার ইচ্ছা নেই।

হঠাৎ তার এই প্রশ্নে বেশ ধাক্কা খেলাম। বললাম, কি?

সে বললো, না তোমার চোখ দেখে তো মনে হচ্ছে ম্যানহোলে পড়তে যাচ্ছো। কি ব্যাপার, কাহিনী কি?

তার কথা শুনে আমার হার্টবিট বেড়ে গেল। সে কি কিছু আচ করতে পেরেছে? তারপরও চেহারা স্বাভাবিক রেখে বললাম, আরে ধ্যাৎ, কি যে বলো না। বলে একদম চুপ হয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে রইলাম।

সে বললো, কি ব্যাপার এই টপিকে আসার সঙ্গে সঙ্গে একদম চুপ হয়ে গেলে যে।

খুব বিরক্তভাবে বললাম, ওফ, এই বিষয় বদলাও তো।

সে বললো, তুমি আগে শেষ করো কথা। তারপর বদলাবো আর তুমি অন্যদিকে তাকিয়ে কথা বলছো কেন? আমার চোখের দিকে তাকাও।

তার চোখের দিকে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হলো আমি হারিয়ে যাচ্ছি। তারপরও খুব স্বাভাবিক কণ্ঠে বললাম, কি বলো।

সে টেবিলের ওপর থেকে আমার হাতটা তার হাতের মধ্যে নিয়ে খুব নরম কণ্ঠে বললো, আমি যা শুনেছি তা কি সত্যি?

বললাম, তুমি কার কাছে কি শুনেছো জানি না আর না শুনে কিভাবে বলবো তুমি সত্যি শুনেছো, না মিথ্যা শুনেছো।

সে বললো, তুমি খুব ভালো করেই বুঝতে পারছো আমি কার কাছে কি শুনেছি।

চুপ করে নিচের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কারণ আমি ধরা পড়ে গেছি। মনে মনে আমার সেই বান্ধবীকে গালাগাল করছিলাম যার মাধ্যমে ওর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। যাকে বলেছিলাম, তাকে আমি পছন্দ করি। ফাজিলটা তাকে নিশ্চয়ই সব বলে দিয়েছে। বলতো, আরো কয়েকদিন পরে বলতো। এতো তাড়াতাড়ি কেন?

এরপর সে হাত দিয়ে আমার মুখ সোজা করে দিয়ে বললো, নিচের দিকে তাকিয়ে আছো কেন? আমি নিচে না, তোমার সামনে। হ্যা, এবার বলো, আমি যা শুনেছি তা কি সত্যি?

আমি একদম চুপ। কারণ এর জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। এভাবে ধরা খাবো জীবনেও ভাবিনি।

সে বললো, কি হলো কথা বলছো না কেন?

বললাম, কি বলবো?

সে বললো, উত্তর দাও।

বললাম, আচ্ছা যাও, তুমি যা শুনেছো তা সত্যি।

সে বললো, যাক, স্বীকার করলে। এখন কি চাও?

কোনো কথা না বলে দুই হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বসে থাকলাম।

সে আমার মুখের ওপর থেকে হাত দুটো তার হাতের মধ্যে নিয়ে বললো, তুমি যদি চাও তাহলে আমাদের বন্ধুত্ব থাকবে। আর তুমি যদি চাও তবে আমাদের মধ্যে বন্ধুত্বের চেয়েও বেশি সুন্দর একটা সম্পর্ক তৈরি হবে।

বললাম, বুঝতে পারছি না আমার কি করা উচিত।

তারপর আমরা দুজনেই চুপচাপ অনেকক্ষণ বসে রইলাম। তাকে বললাম, আমাকে এখন যেতে হবে, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

সে বললো, তুমি আমাকে তোমার সিদ্ধান্ত না জানিয়ে কোথাও যাবে না।

তাকে বুঝিয়ে বললাম, দেখো আমি এখন কিছুই বলতে পারবো না। কারণ ব্যাপারটার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। আমি তোমাকে রাতে ফোন করবো।

সে বললো, মনে থাকে যেন।

বাসায় গিয়ে ভেবে দেখলাম, তাকে ছাড়া আমার চলবে না। আমি তাকে খুব ভালোবাসি। এরপর তাকে ফোন করে জানিয়ে দিলাম, তাকে বন্ধুর চেয়েও বেশি কিছু হিসেবে সারা জীবনের জন্য পেতে চাই। এরপর আমার জীবনের ছকটাই পুরো বদলে গেল। যে আমি ছিলাম প্রচণ্ড ফাজিল, চঞ্চল, বাদর, টাংকিবাজ একটা মেয়ে সেই আমি আজ কারো সঙ্গে এনগেজড।

কোথাও সুন্দর একটা ছেলে দেখলেই যে আমি দুষ্টুমি শুরু করে দিতাম সেই আমি এখন সারা দিন বসে একজনকে স্বপ্ন দেখি। ওর ছোটখাটো জিনিস আমার খুব ভালো লাগে। সে আমাকে কোনো কিছু বললে না করতে পারি না। সব সময় আমার সুবিধা–অসুবিধার দিকে সে লক্ষ্য রাখে। আমার কখনো মন খারাপ থাকলে এমন সব কাণ্ড করে যে, আমার মন ভালো হয়ে যায়। আমি কোনো বিপদে পড়লে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে এর সমাধান বের করে দেয়। আমরা দুজন সব সময় যে কোনো কাজ দুজনকে জানিয়ে করি। আমরা দুজন যখন এক সঙ্গে কোথাও বসি তখন সব সময় আমার হাত ধরে সে বসে থাকে। আমি কিছু বললে খুব মিষ্টি একটা হাসি দিয়ে বলে, আমি তো তোমার হাতই ধরেছি।

সে একটু পর পর আমার গাল টানে।

এমনিতে কেউ আমার মুখ ধরলে আমার খুব বিরক্ত লাগে। কিন্তু সে আমার গাল টানলে আমার খুব ভালো লাগে।

আমার অজস্র ছেলে বন্ধু আছে। তাদের অনেকের জন্য আমার অনেক বান্ধবী পাগল। কিন্তু আমার কাছে তার সামনে অন্য সবাইকে ম্লান মনে হয়। সে আমার কাছে সবার থেকে আলাদা। যদিও সে প্রায়ই আমার মেজাজ খারাপ করে দেয় এই বলে যে, তুমি আমার সঙ্গে কেন জড়ালে। তুমি চাইলেই আমার থেকে অনেক ভালো ছেলে পেতে। তাকে কেমন করে বোঝাই, সে আমার সব কিছু।

আমার এক বন্ধু সেদিন আমাকে বলেছিল, দোস্ত, তোর মতো মেয়ে কিভাবে কারো প্রেমে পড়ে।

তখন হেসে বলেছিলাম –

আমি তো প্রেমে পড়িনি,
প্রেম আমার ওপরে পড়েছে।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক